বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত

ও

ষড়্‌দর্শনের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

মনুসংহিতা ও ঋগ্বেদ অনুবাদক

স্মার্ত্তচূড়ামণ্যুপাধিক

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

প্রণীত।

৩য় সংস্করণ।

—:০:—

কলিকাতা।

৪১ নং পটুয়াটোলা লেন, বেদ যন্ত্রে

শ্রীজগবন্ধু ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও

৪১ নং পটুয়াটোলাস্থ ঋগ্বেদ প্রচার কার্য্যালয় হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯৫ সাল, আষাঢ়।

মূল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যতমদেবতা—

৺কৃষ্ণগোবিন্দ দেবশর্ম্মা পিতা মহাশয়ের
ভুবন বিখ্যাত পবিত্র নামের
স্মরণার্থ এই গ্রন্থ তাঁহা-
রই নামে ভক্তি
শ্রদ্ধার সহিত
সমর্পিত
হইল।

দাস—
শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মা।

মামুদপুর,
জেলা ময়মন সিংহ।

বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত সম্বন্ধে

পণ্ডিতগণের মন্তব্য।

এই গ্রন্থ নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন না করিলে ইহাতে প্রবেশাধিকার জন্মে না। বেদের উৎপত্তি কাল সম্বন্ধে যেরূপ দেখাইয়াছেন, যুক্তি মন্দ নহে। বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের সমালোচনটী পাঠ করিয়া কেবল যে আনন্দিত হইয়াছি এমত নহে, জ্ঞানলাভও করিয়াছি। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন পক্ষে যে সমস্ত যুক্তিপ্রদ ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অকাট্য। আপনি চতুর্ব্বেদ অঙ্গীকার করিয়া ত্রিবেদ সংস্থাপনের উদ্যোগী; আমারও বিশ্বাস ঐরূপ। আপনি যে বহু যত্ন ও প্রচুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া দার্শনিকদিগের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থের গৌরব আর বৃদ্ধি হইয়াছে। ন্যায়দর্শনের সমালোচনা ৮৬ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি মনোরম।

অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামস্।

এরূপ গ্রন্থ পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ আদরের ধন। আপনার প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও বহুদর্শীতা গুণে একখানি গ্রন্থেই ভারতীয় বহু গ্রন্থের তত্ত্ব পাওয়া যায়।

রেভাঃ জে, ওয়েঙ্গার, ডি, ডি ।ব্যাপটিষ্ট মিসন্।

সাঙ্খ্যের ছায়া লইয়া ভারতে পৌত্তলিকতার আবির্ভাব আপনি যেরূপ দেখাইয়াছেন তাহা অতীব যুক্তিপ্রদ।

শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

"দার্শনিকদিগের মত" যেরূপ ভাবে লিখিত হইয়াছে, আমরা বিবেচনা করি, হিন্দু দর্শনশাস্ত্র যাঁহারা কখনও পাঠ করেন নাই বা যাঁহারা ইংরাজী পুস্তকে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের মত কিছু কিছু পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। আমাদিগের বিশেষতঃ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। যড়দর্শনের মূল, সূত্র, ভাষ্য এবং অনুবাদ এমন সরল যে বুঝিবার জন্য অধ্যাপকের নিকট যাইতে হয় না। যাঁহারা হিন্দু যড়দর্শন পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন। বঙ্গবন্ধু

হিন্দু দর্শনশাস্ত্র যে কয়েক খানি দেখিয়াছি তন্মধ্যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমাদিগের সকলেরই এক বার ইহা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র লাহা, মিশনরী—কলিকাতা।

বেদান্তদর্শনের মায়া এবং সাঙ্খ্যের প্রকৃতি যে এক অথচ পৃথক্ তাহা সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়াছেন। আপনি যে যড়দর্শনজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। আপনার অধ্যবসায়, বিপুল পরিশ্রম, এবং বহুদর্শীতার সহস্র ধন্যবাদ করি। আজ সমাজ একটী গুপ্ত রত্নের পরিচয় পাইলেন, ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হই না।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক।

বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত।

মীমাংসাদর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

বেদ কোন সময়ে রচিত হয় তাহার বিশেষ প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান প্রাচ্য পণ্ডিত মোক্ষ-মুলর বেদের উৎপত্তি কাল খৃষ্টীয় শকের ১০০০ সহস্র কি ১২০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তার হগ বলেন, খৃষ্টীয় শকের ১৪০০ হইতে ২০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বে-দের উৎপত্তি। তাঁহারা কেবল ভাষা বিচার দ্বারা ঐরূপ সময় নির্দ্দেশ করেন। অস্মদ্দেশীয় আর্য্যজাতীর বেদ সম্বন্ধে এতদূর প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে যে, বেদ সেই অনাদি অনন্ত দেবের নিশ্বাসে সৃষ্ট, কোন পুরুষ ইহার রচয়িতা নন। এ মতের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে গেলে প্রাচীন সমাজ অদ্যই আমাদিগকে অভি-সম্পাতে জীবন্ত সমাহিত করিবেন। আবার, পূর্ব্বোক্ত মতে বিশ্বাসী হইলে উনবিংশ শতাব্দীর নব্যসম্প্রদায় ইতিহাসানভিজ্ঞ বলিয়া বিদ্রূপ করিবেন। অতএব ইহার সময় নিরূপন কার্য্য পাঠকদিগের উপরই রহিল, তাঁহারা

স্ব স্ব জ্ঞান ও রুচি অনুসারে বেদ স্বষ্ট, অস্বষ্ট, পৌরুষেয়, অপৌরুষেয় যাহা ভাল বুঝেন তাঁহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লইবেন। আমি মাত্র বেদ সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় ষড়দর্শন কর্ত্তাগণ কি বলিয়া গিয়াছেন তাহাই দেখাইব। তবে ইহা নিশ্চয় যে, যখন আর্য্যপুরুষগণ হলস্কন্ধে গোধন সহ সিন্ধুনদীর পশ্চিম পার হইতে পূর্ব্ব পারে উত্তীর্ণ হইয়া ঘোর বিদেশে আসিয়া পড়িলেন, যখন দেখিলেন এদেশ বাসী অনার্য্যগণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে ও তাঁহাদিগের অগ্নি পূজার ব্যাঘাত করিতে আরম্ভ করিল তখনই অতি কাতর ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"বিজানী হ্যার্য্যান্ যেচ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদ ব্রতান্।"

"বিদ্বান্ বজ্রিন্ দস্য বেহতি মস্যার্য্যং সহোবধয়া দ্যুম্নমিন্দ্রঃ।"

"সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্য মতক্ষদ্ব্রহ্ম হরি যোজনায়। ইমাংতে বাচং বস্যুয়ন্ত আয়বো রথং নধীরঃ স্বপা অতক্ষিষুঃ সুম্নায় সামতাক্ষিষু।" ঋগ্বেদ।

এই এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতিকে আরাধনা করিতেন, সেই সেই গুলিই ঋগ্বেদের মূল সূত্র। এই সময় হইতেই

ভারতে বৈদিক কাল উপস্থিত হয়। চতুর্দ্দিক হোমানলে পবিত্রীকৃত, পশু রক্তে মেদিনী অনুরঞ্জিত এবং আর্য্যগণ কেবল মাত্র সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তনেই ব্যস্ত। দেখিতে দেখিতে বৈদিক কালের মধ্যমাবস্থা। বেদ বিরোধী হইবার সাধ্য নাই, বেদ অস্বীকার করিলে তাহাকে চোরের ন্যায় বধ কর এরূপ দণ্ডবিধি ঋষিগণ প্রচার করিলেন, আর্য্যগণ সর্ব্বে সর্ব্বা, অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী। অনার্য্য দস্যুগণ বশীভূত হইয়াছে তাহাদিগকে উত্তমরূপে ধর্ম্মবন্ধনে বন্ধন করিয়া আদেশ করিলেন, "আমাদিগের সেবা করিলেই তোমাদিগের পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে।" আর্য্য পুরুষগণ যতই কঠিন বিধি প্রচার করিতে লাগিলেন, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ততই তাঁহাদিগের উপর বিরক্ত হইতে লাগিল। ঠিক্ এই সময়ই কয়েক জন ঋষি উপাসনা, রক্ত তর্পন, হিংসাভাব ও অতিরিক্ত প্রাধান্যের প্রতিদ্বন্দী হইয়া কেহ বলিলেন জগৎ সৃষ্ট, কেহ অসৃষ্ট, কেহ ব্রহ্ম কে? প্রকৃতিই মূল, রক্ত পাত কেন? জাতি ভেদ কিসের? ইত্যাদি বৈদিক কার্য্যের উপর দোষারোপ করিয়া দর্শনশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। কোন আস্তিক মহর্ষি আবার ইহাঁদিগের প্রতিযোগী দর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে আমাদিগের দেশে দর্শন শাস্ত্রের মূল সূত্র সকল রচিত হয়, পরে সেই সকল সংক্ষিপ্ত সূত্র হইতে কত সহস্র সহস্র ভাষ্য অনুভাষ্য

হইয়াছে, বোধ করি একটি মানব সমস্ত জীবন অধ্যয়ন করিলেও সমাধা করিতে পারেন কি না সন্দেহ?

ষড়্দর্শন যথা—

জৈমিনী প্রণীত—পূর্ব্ব মীমাংসা বা মীমাংসা।

বাদরায়ণ বা বেদব্যাস প্রণীত—
উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত।

কপিল প্রণীত—সাংখ্যদর্শন।

পতঞ্জলি প্রণীত—পাতঞ্জল বা যোগশাস্ত্র।

গৌতম বা অক্ষপাদ প্রণীত—
ন্যায়দর্শন বা আন্বিক্ষিকি বিদ্যা।

কণাদ প্রণীত—বৈশেষিকদর্শন।

ইহার মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্ত এক যুগল, সাংখ্য ও পাতঞ্জল এক যুগল, ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিকদর্শন এক যুগল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা সর্ব্ব প্রথমে মহর্ষি জৈমিনীর দর্শনের সমালোচন করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব যে, তিনি বেদবিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শন জৈমিনী প্রণীত। উহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত; ইহাতে বেদের মীমাংসা আছে বলিয়া ইহার নাম মীমাংসাদর্শন। ইহা শ্রুতি এবং স্মৃতির মধ্যস্থস্বরূপ, ধর্ম্মদর্শনের

আদর্শস্বরূপ এবং দুর্গম নিগম পথে সুখ সঞ্চলনের বাষ্পীয় স্যন্দনস্বরূপ। বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ নিশ্চয় এবং বিরোধভঞ্জনের নিমিত্ত মীমাংসাদর্শন অতীব উপযোগী। এই দর্শনে অনেকগুলি অধিকরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক একটী বিষয়ের এক একটি সিদ্ধান্তকে অধিকরণ কহে। মীমাংসা দর্শনাধ্যায়ীদিগকে মীমাংসক বলে।

মীমাংসকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া, বেদের নিত্যত্ব প্রমাণ করেন। সুতরাং শব্দের নিত্যানিত্যত্ব বিচার সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। শব্দ এবং অর্থ উৎপত্তি হইলে পর তাহাদিগের মধ্যে অমুক শব্দে অমুক অর্থ বোধ হয়, এইরূপ সংকেতাত্মক সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া থাকে, সেই লোককল্পিতসম্বন্ধ জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। অতএব শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ কল্পিত বলিয়া যেরূপ শুক্তিকাদিতে রজতাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রান্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ শব্দে সত্য ব্যভিচারও সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে বেদবাক্য সকল কল্পিত সংকেতাত্মক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ হেতু অপ্রমাণ এবং নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই আপত্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত মীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনী বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্য অর্থেন সহ সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্য।" ১।১।৫।

"শব্দস্য নিত্যবেদ ঘটকপদস্য অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম ইত্যাদেরর্থেন সম্বন্ধঃ ঔৎপত্তিঃ স্বাভাবিকো নিত্য ইতি যাবৎ। অতস্তস্য ধর্ম্মস্য ইতি শেষঃ। জ্ঞানমাত্র করণে ল্যুট্ জ্ঞপ্তের্যথার্থজ্ঞানস্য করণং উপদেশঃ অর্থপ্রতিপাদনং। অব্যতিরেকঃ অব্যভিচারী দৃশ্যতে। অনুপলব্ধে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরজ্ঞাতে অর্থে তৎবিধিঘটিতবাক্যং ধর্ম্মে প্রমাণং বাদরায়ণাচার্য্যস্য সম্মতমিতি ভাষ্যং।"

শব্দ এবং অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্যবোধক ভাব স্বাভাবিক ও নিত্য। অতএব বেদ বাক্য সমূহ ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ নিরপেক্ষ অজ্ঞাত বিষয়ে অভ্রান্ত উপদেশ প্রদান করে। সুতরাং বেদ প্রমাণ এবং নিত্য।

নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব অস্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদান করেন। যথা—

(১) "কর্ম্ম একে তত্র দর্শনাৎ।"

শব্দ যত্ন করিলেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং শব্দ যত্ন সাপেক্ষ এবং কর্ম্ম। অতএব শব্দ নিত্য হইতে পারে না, যেহেতু যাহা নিত্য তাহা সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকিবে এবং যত্ন দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না।

(২) "অস্থানাৎ।"

শব্দ ক্ষণস্থায়ী, যে সময়ে উৎপন্ন সেই সময়েই বিনষ্ট হয়, সুতরাং শব্দ নিত্য হইতে পারে না।

(৩) "করোতিশব্দাৎ।"

'শব্দং করোতি' শব্দ করে এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া শব্দ নিত্য হইতে পারে না, কারণ ইহা কৃত।

(৪) "সত্বান্তরে যৌগপদ্যাৎ।"

এক কালেই নিকটস্থ এবং দূরস্থ বহু ব্যক্তির কর্ণগোচর হইয়া থাকে, সুতরাং শব্দ এক ও নিত্য কিরূপে হইবে?

(৫) "প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ।"

যে পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল তাহা নিত্য হইতে পারে না। শব্দেরও প্রকৃতি বিকৃতি ভাব দৃষ্ট হয়; যথা দধি অত্র দধ্যত্র। সুতরাং শব্দ নিত্য নহে।

(৬) "বৃদ্ধিশ্চকর্ত্তৃভূম্নাস্য।"

শব্দ কর্ত্তার সংখ্যাভেদে শব্দের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দশ ব্যক্তি যদি এককালীন গো শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে দশটি গো শব্দ একবারে উচ্চারিত হইল। সুতরাং মীমাংসকদিগের নিত্যত্ব স্বীকার নিস্ফল, ঐরূপ শব্দের নিত্যত্বে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা পায় না।

মীমাংসকেরা এই আপত্তি গুলির বক্ষ্যমাণ প্রকারে উত্তর দেন। যথা,—

(১) "সতঃপরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।"

শব্দ নিত্য হইলেও যে সর্ব্বকালে উপলব্ধ হয় না তাহার হেতু এই যে, সর্ব্ব সময়ে উচ্চারণকারী ব্যক্তির

সহিত শব্দের সন্নিকর্ষ থাকে না। গ কার এই শব্দ শ্রবণ করিলেই আমাদিগের এইরূপ জ্ঞান হয় যে, সর্ব্বদা আমরা যে গ কার শ্রবণ করিয়া থাকি ইহাও সেই গ কার, তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র গ কার নহে।

(২) "প্রয়োগস্য পরমং।"

'শব্দং করোতি' এই বাক্যের অর্থ শব্দ নির্ম্মাণ নহে, কিন্তু শব্দ উচ্চারণ মাত্র।

(৩) "আদিত্যবৎ যৌগপদ্যং।"

যেরূপ এক সূর্য্য নিকটস্থ এবং দূরস্থ সকল লোকেরই দৃশ্য হইতেছে, তদ্রূপ এক শব্দ বহু ব্যক্তির শ্রব্য হইতে পারে।

(৪) "বর্ণান্তরমবিকারঃ।"

বর্ণান্তরকে বর্ণের বিকার বলা উচিত নহে, যেহেতু ই কার স্থানে য কার হইলে বর্ণান্তর প্রয়োগ হইল, ই কারের কোন বিকার হইল না।

(৫) "নাদবৃদ্ধিঃ পরা।"

দশ ব্যক্তি এক গো শব্দ উচ্চারণ করিলে দশটি গো শব্দ উচ্চারিত হইল বটে, কিন্তু তাহা কেবল নাদ বৃদ্ধি মাত্র, শব্দ বৃদ্ধি নহে। এক গো শব্দ একই রহিল, তবে দশ বার উচ্চরিত হইল বলিয়া, গোলমাল অধিক হইল। অতএব কোন প্রকারেই শব্দের একত্ব এবং নিত্যত্বের হানি

হইতে পারে না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব অব্যাহত রহিল।

অতঃপর মীমাংসাকার শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

(১) "নিত্যস্তু স্যাৎ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।"

শব্দ উচ্চারিত হইলেই অন্য ব্যক্তি ঐ শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারেন, অতএব শব্দ অবশ্য নিত্য হইবে। যদি শব্দ নিত্য না হইত তাহা হইলে কেহই শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত না, কারণ শব্দ উচ্চারণ মাত্র বিনষ্ট হইবে। এবংবিধায় উচ্চারণ অবধি অর্থ বোধ পর্য্যন্ত শব্দের স্থিতি মানিতেই হইবে, নচেৎ বিষম দোষ ঘটে। এইরূপ শব্দের স্থিতি মানিলেই শব্দের নিত্যত্ব স্বতঃ প্রমাণ হইল।

(২) "সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।"

ভিন্ন ভিন্ন পুরুষেরা এককালে এক শব্দের সমভাবে এবং অভ্রান্তরূপে প্রত্যভিজ্ঞা করিতে পারেন, যেহেতু শব্দ নিত্য এবং একস্বরূপ।

(৩) "সংখ্যাভাবাৎ।"

শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি নাই। একটি গো শব্দের বারংবার উচ্চারণ করিলে ঐ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত শব্দগুলি সংখ্যাবচ্ছেদে পরস্পর বিভিন্ন নহে।

(৪) "অনপেক্ষত্বাৎ।"

শব্দের বিনাশ অনুমান করিবার কোন কারণ বা অবলম্বন নাই, সুতরাং শব্দ অনিত্য কেন হইবে ?

(৫) "লিঙ্গদর্শনাৎ চ।"

বেদসংহিতাতেও শব্দের নিত্যত্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে, যথা—

"বাচা বিরূপ নিত্যয়া।"

ঋগ্বেদ ৮ মং, ৬৪ সূ, ৬ ঋক্।

এইরূপ বহুবিধ যুক্তি দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রমাণ করিয়া মীমাংসকেরা বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করেন। বেদ শব্দ রাশি মাত্র। শব্দ নিত্য, এবং প্রমাণ।

যদিও মহর্ষি প্রমাণ করিলেন যে বেদ নিত্য, কিন্তু অপ্রামাণিকতা বেদের মধ্যেও অনেক স্থানে আছে। অচেতন বস্তুতে চেতনত্বারোপ করিয়া অর্থ বন্ধন ইত্যাদি অত্যন্ত অযুক্ত উপদেশ, বেদেও অসদ্ভাব নাই ; যথা, হে ওষধে ! তুমি ইহাকে রক্ষা কর ; হে পাষাণ সকল ! তোমরা শ্রবণ কর ; হে ক্ষুর ! তুমি ইহার কোন অনিষ্ট করিও না। ইত্যাদি। "তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।২১।" পুনশ্চ বেদে অনিত্য সংযোগ আছে, যথা—কীকট নামে দেশ, নৈচাশাখ নামে নগর, গান্ধার নামে দেশ, প্রমগন্ধ রাজা নগ্নজিৎ নৃপতি, প্রবহণের পুত্র ববর, এবং কঠ, কলাপ প্রভৃতি ঋষি অথবা মন্ত্র সম্বন্ধীয় পুরুষ। অতএব প্রমগন্ধাদির পূর্ব্বে বেদের অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং বেদ অনিত্য।

জৈমিনীদর্শনের সারসংগ্রহস্বরূপ মাধবাচার্য্যের ন্যায়-মালাবিস্তর গ্রন্থে বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে মত অতি পরিষ্কাররূপে বিন্যস্ত আছে। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে জৈমিনীদর্শন প্রস্তাবে বেদ যে অপৌরুষেয় এ বিষয়ে অনেক অনুমান প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বেদের নিত্যত্ব সম্বন্ধে সারপ্রদ নহে।

মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বেদের অর্থ নিত্য, বর্ণবিন্যাস এবং বর্ণের আনুপূর্ব্বী নিত্য নহে। প্রতিকল্পে মহর্ষিরা এই অর্থানুসারে বর্ণবিন্যাস করিয়া বেদ-শাখা রচনা করেন, এই নিমিত্তই বেদ-শাখার কাঠক, কালাপক, মৌদক, পৈপ্পলাদক প্রভৃতি নাম হইয়া থাকে।

মহর্ষি জৈমিনী বোধ হয় ন্যায়দর্শনাদির গোলে পড়িয়া বেদের প্রামাণ্য রক্ষার্থ অগ্রসর হওত——

"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"

লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ধর্ম্মই জিজ্ঞাস্য। প্রশ্নটি অতি গভীর ও উপাদেয়, কিন্তু সেই ধর্ম্ম কেবল মাত্র ব্রাহ্মণেরই সাধ্যায়ত্ত ও করণীয়। তাঁহার মতে বেদ ঈশ্বর নির্ম্মিত নয়, পুরুষ নির্ম্মিতও নয়, অর্থাৎ বেদের কর্ত্তা কেহই নাই। উহা কেবল শব্দ ও অর্থ এতদুভয়ের সম্বন্ধ মাত্র।

"বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা।"

"অনিত্য দর্শনাচ্চ।" ২৭। ২৮ সূত্র।

মহর্ষি জৈমিনীর মতে দেবতা নামক কোনও জৈব-পদার্থ নাই। ইন্দ্র, এই শব্দই দেবতা, তদ্ভিন্ন সহস্রচক্ষুযুক্ত

বজ্রহস্ত পুরন্দর।

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বাক্য কেবল স্তুতিবাদ মাত্র। যাহা হৌক, মহর্ষি জৈমিনীর এই কর্ম্মবাদ ও শব্দের নিত্যত্ব ও একত্ববাদ দ্বারা তাঁহার সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে, কেন না তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন—

"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।"

কিন্তু দর্শনের কোনও স্থানে আর ধর্ম্মের কি ঈশ্বরের নাম গন্ধও নাই, বোধ হয় তজ্জন্যই শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মীমাংসাদর্শনকে নাস্তিক্যদর্শন বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন, যথা—শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং যথায়ং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে, তথা কল্পয়িতব্য। *** ঈশ্বরস্তু ফলং দদাতীত্যনুপপন্নং অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্র কার্য্যানুপপত্তেঃ বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য প্রসঙ্গাদনুষ্ঠান বৈয়ার্থ পত্তেশ্চ তস্মাদ্কর্ম্মা দেব ফলং। শং ভাষ্য। জৈমিনীর পক্ষে এরূপ নিরীশ্বরবাদ ভয়ানক অসঙ্গত বোধ হয়, কেন না তিনি অন্য সকল পদার্থকে তুচ্ছ করিয়া কেবল বেদ ও ধর্ম্মেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বিহীনে শাস্ত্রই বা কি আর বেদই বা কি? সুতরাং মীমাংসাদর্শন মতে বেদের কিছুই মীমাংসা হইল না, বিশেষতঃ জৈমিনী বেদের কর্ত্তা

কেহ নাই, এবং শব্দের একত্ব ও নিত্যত্বই বেদের মূল-ভিত্তি ইহা স্বীকার করায় বিদ্যোন্মোদ তরঙ্গিনীতে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছেন যথা—

"দেবো ন কশ্চিদ্ভুবনস্য কর্ত্তা
ভর্ত্তা ন হর্ত্তাপি চ কশ্চিদাস্তে।
কর্ম্মানু রূপানি শুভাশুভানি
প্রাপ্নোতি সর্ব্বোঽহি জনঃ ফলানি।
বেদস্য কর্ত্তা ন চ কশ্চিদাস্তে
নিত্যা হি শব্দা রচনা হি নিত্যা।
প্রামাণ্য মস্মিন্ স্বত এব সিদ্ধ
মনাদি সিদ্ধেঃ পরতঃ কথং তৎ।
ব্রহ্মাদয়ঃ কর্ম্ম বশেন ভোগং
কুর্ব্বন্তি সর্ব্বেঽপি চরা চরাস্তু।"

অতএব মহর্ষি জৈমিনীর মতে বেদ শব্দরাশি মাত্র, নিত্য ও এক, উহা কাহারও দ্বারা নির্ম্মিত কি রচিত নয়।

উত্তর মীমাংসা ও পূর্ব্ব মীমাংসার মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহাও এই স্থানে দর্শয়িতব্য। সাম্য এই যে উভয়ই শ্রুতিমূলক, বৈষম্য এই, জৈমিনী বলেন—বেদ ক্রিয়া পর যথা—

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমত দর্থানাং।"

ব্যাসের মতে বেদ জ্ঞানপর। পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্যও উভয়ের বৈষম্য সুন্দর রূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব মীমাংসায় ঈশ্বরবাদ না থাকায় মহর্ষি বেদব্যাস উত্তর মীমাংসা বিধিবদ্ধ করেন। বস্তুত জৈমিনীর মত কেবল মাত্র বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডেই শেষ, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধীয় কি অধ্যাত্মজ্ঞানপ্রদ এমন একটি উপদেশও তদীয় দর্শনের কোথাও পাওয়া যায় না, অথচ গ্রন্থারম্ভে লিখিয়া বসিলেন—

"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা।"

এ সকল ভূমিকা মাত্র। অপরিমিত মহিমা সম্পন্ন বেদই তাঁহার মতে প্রধান, কিন্তু সেই বেদের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম কে, তাঁহার নাম দর্শনে এক বারও উল্লেখ করেন নাই।

অতএব জৈমিনীদর্শন মতে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব কিছুই প্রমাণ হইল না, বরঞ্চ তাঁহা দ্বারা বেদের দুর্ব্বলতাই প্রকাশিত হইল।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই দর্শনকারের নাম বাদরায়ণ বা বেদব্যাস। ইনি উপরিচর রাজার দুহিতা সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি

পরাশরের ঔরসে দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে বেদের বিভাগ করেন বলিয়া ইহাঁর অপর নাম বেদব্যাস হয়। এই মহর্ষি সর্ব্ব প্রথমে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মহাভারত নামক অতি সুবিস্তীর্ণ, বহুগুণযুক্ত, বহু-রসাত্মক কাব্য রচনা করেন। পরে শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, উপ-পুরাণ ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন প্রভৃতি প্রণয়ণ করেন। আমরা ইহাঁর প্রণীত দর্শনের মত সমালোচন করিবার জন্য উপস্থিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

বেদান্তদর্শনের মতে সকলই ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্ম, জীবও ব্রহ্ম। এই মত আবার দুই ভাগে বিভক্ত—পরিণামবাদ এবং বিবর্ত্তবাদ। ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ—এটি পরিণাম-বাদ। জগৎরূপে ব্রহ্ম ব্যাবৃত্ত—এই বিবর্ত্তবাদ।

সার কথা এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমুদয় মিথ্যা। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। এই সকল বিষয় শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

উত্তর মীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে—

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।"

উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে—

"জন্মাদস্য যতঃ।"

সূত্র দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। পরে তৃতীয় পাদের ২৮ সূত্রে—

"অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানু মানাভ্যাং।"

এই সূত্র দ্বারা বৈদিক শব্দ হইতে দেবগণের উৎপত্তি পরিস্ফুট করিয়াছেন। পরে বেদোৎপত্তি সম্বন্ধে—

"শাস্ত্র যোনিত্বাৎ।"

তৃতীয় সূত্রে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কেন না বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—

অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম বেদোঽথর্ব্ব বেদ," ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচর্য্য লিখিয়াছেন—

"নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদি লক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি।"

অর্থাৎ মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বার্থ ভাসকতা শক্তি দৃষ্ট হয়, ইহা বিবিধ বিদ্যা দ্বারা বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বজ্ঞকল্প ঈদৃশ শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞ গুণবিশিষ্ট সর্ব্ববিৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য প্রণেতা কি সম্ভবে? সুতরাং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন।

বেদেতে উক্ত হইয়াছে যে ঋক্, যজু ইত্যাদি বেদত্রয় সেই মহান পরব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে; তাহাতে পরব্রহ্ম সেই সকল বেদ রচনা করিয়াছেন কি না, এই সকল সংশয় উপস্থিত হইলে প্রথমত ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, পরব্রহ্ম বেদ সকলের কর্ত্তা

নহেন। যেহেতু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বেদের নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরে—

"শাস্ত্র যোনিত্বাৎ।"

তৃতীয় সূত্রে এই সিদ্ধান্ত হয় যে অর্থবোধ না করিয়া কেবল নিশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্নে উৎপত্তি হেতু এবং প্রতি-কল্পে সমান ভাবে উচ্চারণ বশতঃ প্রবাহরূপে নিত্য প্রযুক্ত বেদ সকল পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ। অতএব সমুদায় জগতের ব্যবস্থা সম্পাদক সেই বেদের কারণ হেতু পরব্রহ্মেরও সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইল।

"ন কর্ত্তৃব্রহ্ম বেদস্য কিম্বা কর্ত্তৃ ন কর্ত্তৃতৎ।
বিরূপ নিত্যয়া বাচেত্যেবং নিত্যত্ব কীর্ত্তনাৎ॥
কর্ত্তৃনিঃশ্বসিতাৎ যুক্তে নিত্যত্বং পূর্ব্ব সাম্যতঃ।
সর্ব্বাবভাসিবেদস্য কর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্ববিদ্ভবেৎ॥"

অধিকরণ মালা।

অতএব বেদান্তদর্শন মতে বেদ ব্রহ্মকার্য্য। এক্ষণে ব্রহ্ম কে? ইহা বেদান্তদর্শন এইরূপে মীমাংসা করিয়াছেন—

অস্য জগতো নাম রূপাভ্যাং ব্যাকৃত স্যানেক কর্ত্তৃভোক্তৃ সংযুক্তস্য প্রতি নিয়ত দেশকাল নিমিত্ত ক্রিয়া কলা-শ্রয়স্য মনসা প্যচিন্ত্য রচনা রূপস্য জন্ম স্থিতি ভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্‌ব্রহ্মেতি বাক্য শেষঃ।"

অর্থাৎ নাম রূপ দ্বারা প্রকাশিত, অনেক কর্তৃ ভোক্তৃ সংযুক্ত, প্রতি নিয়ত দেশ কাল নিমিত্ত ও ক্রিয়া কালের আশ্রয়, অচিন্ত্য রচনারূপ এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বজ্ঞ কারণ হইতে সম্পন্ন হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম।

অবার ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই ব্রহ্ম।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

বেদান্ত সূত্রের শঙ্করভাষ্য মতে ঈশ্বর সত্য, আর সকলই অবিদ্যা বা মায়া। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা প্রপঞ্চ মাত্র। জরা, মরণ, সুখ ও দুঃখাদি সকলই অবিদ্যাজনিত। বোধ হয় সমস্তই মায়া দ্বারা রচিত, ও জগৎ প্রপঞ্চে পরিপূরিত।

"ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।"

"স্ব মায়য়া রচিতং বিশ্বম্।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অবিদ্যা দ্বারা জীবাত্মা আবদ্ধ হইতে পারেন কি না তাহা সাংখ্য সূত্রের ২০।২১।২২।২৩।২৪ সূত্রে সুন্দর রূপে মিমাংসিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বৈদান্তিকদিগের মধ্যে দুইটি প্রসিদ্ধবাদ আছে, একটি পরিণামবাদ ও অপরটি বিবর্ত্তবাদ। পরিণামবাদীরা বলেন যে ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ

সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং সকলই ব্রহ্ম। বিবর্ত্তবাদীরা জগ-তের বস্তুত্ব স্বীকার করেন। প্রথমবাদে পূজ্য পূজকের ভেদ নষ্ট, দ্বিতীয়বাদে প্রত্যক্ষ সৃষ্টি অবস্তু হওয়াতে ইহাই সিদ্ধ যে, ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। বোধ হয় তজ্জন্য বিদ্যোন্মোদতরঙ্গিনী এইরূপ কটাক্ষ করিয়া বৈদান্তিক ও নাস্তিকের উপাখ্যান অবলম্বন করত ভৎসনা করিয়াছেন যথা, নাস্তিক—

"জগন্মৃষৈবেতি ভবন্মতং চেৎ কিং কল্পতে ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ। আকার শূন্যেন গতঃ ক্রিয়েন কর্ত্তব্যমেতেন কিমস্তি লোকে।"

"শ্রুতিতে—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, ও যাঁহাতে স্থিতি করে এবং অবশেষে যাঁহাতে যাইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম। ভগবদ্গী-তাতেও—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।"

"সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতস্থ চাত্মনি।"

রামানুজস্বামীও জগৎ এবং ব্রহ্ম এক, এই উপদেশ পরিহার করিয়া কেবল প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে লীন হয়, ইহাই মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

যদ্রূপ "নানা জতীয় বৃক্ষের নানাবিধ পুষ্পরস মিলিত হইয়া মধুরূপে পরিণত হইলে ত্রিদোষঘ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব সকল প্রলয়বস্থায় ভগবানে বিলীন ভাবে থাকিলেও স্বষ্টিকালে পৃথক হইয়া উৎপন্ন হয়। নদী ও সমূদ্রে ভেদ দেখা যায়, নদী সকল শুদ্ধ জলময়, কিন্তু সমুদ্র লবণ জলে পরিপূর্ণ। তেমনি বিলক্ষণ গুণ নিবন্ধন জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দৃষ্ট হয়. নদী সকল চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সমুদ্রে মিলিতা হইলে যেমন কোনও ইতর বিশেষ করিতে পারা যায় না, অথচ তাহাতে লবণ ও শুদ্ধ জলের বস্তুতঃ ভেদ থাকে, তেমনি জীব ও ঈশ্বর আপাততঃ একাকারে প্রতীয়-মান হইলেও তাহাদের প্রকৃত ইতর বিশেষ ভাব থাকে। দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলে তাহা পৃথক করা অপরের অসাধ্য হইলেও হংসগণ তৎক্ষণাৎ জল বিভাগ করিয়া দুগ্ধ পান করিতে সমর্থ হয়, তেমনি লোক সকল লয় কালে সর্ব্বেশ্বরে বিলীন থাকে, কিন্তু ভক্তেরা গুরূপদেশানুসারে তাহার ভেদ করিতে সত্বরেই সমর্থ হন। নির্ম্মলান্তঃ-করণ সাধুব্যক্তিগণ বলেন যখন আমরা উভয় বস্তুকেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তখন দুগ্ধে দুগ্ধ ও জলে জল মিশ্রিত করিলেই যে কেবল দুগ্ধ ও জল অভিন্ন হইয়া যায় তাহা হইতে পারে না, অতএব জীব সকল ধ্যান যোগ প্রভাবে পরম পুরুষে বিলীন হইলেও একতা পাইতে পারে না।"

রামানুজ এই প্রকারে অদ্বৈতবাদের বাধা দেখাইয়া দ্বৈতবাদ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করেন, যথা—

"অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতি প্রবৃত্তো ভব। সোঽহং জ্ঞান মিদং ভ্রমস্তজ ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরেঃ।"

ফলতঃ এরূপ অদ্বৈতবাদ নাস্তিকতার রূপান্তর মাত্র।

"সোঽহং, এবং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

কত জনে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে? অনেকে বেদান্ত সূত্রকে অদ্বৈতবাদের আদি কারণ বলেন; শঙ্করাচার্য্যের শারীরিক ভাষ্য অদ্বৈতবাদ স্থাপনের পক্ষপাতী, বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য উদ্দেশ্য ভুলিয়া এরূপ করিয়াছেন, নচেৎ বেদান্তকে কেন অদ্বৈতবাদ বলিবেন? যেহেতু বেদান্ত সূত্রগুলি শ্রুতির অনুগত, অথচ সেই শ্রুতি বলিতেছেন যে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্য
নশ্নন্ন ন্যোঽভি চাক্‌শীতি॥

ঋগ্বেদ ১ মণ্ডল, ২২ অধ্যায়, ১৬৪ সূত্র, ২০ শ্লোক।

অর্থাৎ দুইটি সুন্দর পক্ষী প্রণয়ে মিলিত হইয়া সখ্যভাবে

এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, একজন সুস্বাদু ফল ভোজন করিতেছেন, অপরটি নিরাহারে থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন। এই দুইটি পক্ষীর ফলাশীটি জীবাত্মা, নিরাহারিটী পরমাত্মা; এ বচনটি কি অদ্বৈতবাদের? কখনই নয়, বরঞ্চ উহা দ্বৈতবাদের চরমোৎকর্ষ।

ব্রহ্ম মীমাংসার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদের ত্রয়োবিংশ সূত্রে লিখিত আছে,—ব্রহ্ম প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ। "যেমন অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, তেমনি নিঃশ্রেয়সের হেতু বলিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাও হইয়া থাকে। যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হইয়া থাকে তাঁহার নাম ব্রহ্ম। এইরূপে ব্রহ্মকে সামান্য কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা গিয়াছে; কিন্তু তিনি উপাদান কারণ, কি নিমিত্ত কারণ তাহার কিছুই স্থির করা হয় নাই। ঘট ও কুণ্ডলাদির প্রতি মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যেমন উপাদান কারণ, জগতের প্রতি তিনিও কি তেমনি উপাদান কারণ; অথবা কুলাল ও স্বর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্ত কারণ? কোন কারণ তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন, যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতিযুক্তি এবং অনুভব দ্বারা পাওয়া যাইতেছে তখন ব্রহ্মকে নিমিত্ত কারণ ভিন্ন আর কোন কারণই বলা যাইতে পারে না। কেন না তিনি আদৌ অভিধ্যান পূর্ব্বক প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ শ্রুতি তাৎপর্য্যে তিনি অভিধ্যান পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়া-

ছেন বলিয়া তাঁহার নিমিত্ত কারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হই-তেছে। আর লোক ব্যবহারেও দেখা যাইতেছে যে, ঘটা-দির নিমিত্ত কারণ স্বরূপ কুলালাদিরা অভিধ্যান পূর্ব্বকই সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং তদনুসারে তাহারা যাহা যাহা ইচ্ছা করে তাহাই নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয়। এক একটী ক্রিয়ার নিষ্পত্তির প্রতি অনেকগুলি কর্ত্তা আব-শ্যক হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এই লৌকিক যুক্তি আদিকর্ত্তাতে বর্ত্তাইলেও বস্তুতঃ কোনও হানি হইতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব যখন প্রসিদ্ধ আছে, তখন তাঁহার নিমিত্ত কারণ হইবার ব্যাঘাত কি? বৈব-স্বত প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যখন কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তখন পরমেশ্বর নিমিত্ত কারণ রূপে গণ্য হওয়া অযুক্ত নহে। বিশেষতঃ উপাদান কারণ ও কার্য্য এতদুভয়ের এক রূপতা হওয়াই অনুভবসিদ্ধ ও সম্ভব। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ যেমন সাবয়ব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ দেখা যাইতেছে, তেমনি ইহার উপাদান কারণও সাবয়ব অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ হইলেই শোভা পায়। ব্রহ্ম তো তাদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত নহেন, তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিষ্পাপ, শান্ত, নিরবদ্য এবং নিরঞ্জন বলিয়া শ্রুতিতে প্রতি-পাদিত হইয়াছেন। অতএব স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, প্রস্তাবিত অশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, স্মৃতি প্রতি-

পাদিত ব্রহ্মেতর কোনও পদার্থ এই জগতের উপাদান কারণ হইবে। যদি বল, শ্রুতিতে ব্রহ্মের কারণত্ব নির্দ্দেশ আছে, তাহার উত্তর—কারণ। কিন্তু শ্রুতি নিমিত্ত কারণপর। বরং আমরা এই বলিয়া মীমাংসা করিতে চাই যে, ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ এবং ব্রহ্মই উপাদান কারণ, নচেৎ শ্রুতিগত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়েতেই জলাঞ্জলি দিতে হয়।

শ্রুতি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্পষ্টাভিধানেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান। পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রৌত দৃষ্টান্তের উদাহরণ এই যে, যেমন নিরবচ্ছিন্ন এক মাত্র মৃত্তিকা পিণ্ড জানিতে পারিলে সকল মৃন্ময় পদার্থ অবগত হইতে পারা যায়, এবং এক খানি চুম্বক লৌহের স্বরূপ জানিতে পারিলে তাবৎ লৌহময় ও কার্ষ্ণায়স জানিতে পারিলে সমুদায় কৃষ্ণলৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য অবগত হইতে কিছু বাকি থাকে না। কিন্তু এমত স্থলে উপাদান কারণ ও কার্য্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ ব্রহ্মের উপাদান কারণত্বের প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত শ্রুতিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—যদি আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত, এবং বিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহা হইলে স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম অধিষ্ঠাতৃ বিহীন বলিয়া নিমিত্ত কারণ, এবং তাঁহার আর স্বতন্ত্র প্রকৃতি নাই বলিয়া উপাদান কারণ।

বেদান্ত মতে মায়াবাদ দ্বারা যাহাই কেন প্রতিপন্ন হউক না, আত্মা যে নিত্যমুক্ত তাহার সন্দেহ নাই। ভগবদ্গীতায় আত্মা জীবশরীরস্থ হইয়াও কিরূপে নির্লিপ্ত, তাহা সাংখ্যের ছায়া আশ্রয় করিয়া বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে।

"প্রকৃত্যৈবেচ কর্ম্মাণি।" গীতা।

পুনশ্চ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

"অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্ত সর্ব্ব বস্তুষু, কিন্ত্বস্য বন্ধনং।"

"অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি", "সর্ব্বতঃ পাণি পাদহস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং।"

যাহা হউক, এই মায়াবাদ এবং অদ্বৈতবাদের শাসন ত্যাগ করিলে কেবল যুক্ত্যনুযায়ী মায়াবাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

মহাত্মা শাক্যসিংহও শ্রুতি হইতে এই মায়াবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী পৌরাণিক পণ্ডিতগণ অদ্বৈতবাদের ঘোর প্রতিবাদী, যথা—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদ মবৈদিকং।
ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশ কারণম্॥"
"মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্র প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মেবচ।"

পদ্মপুরাণ।

অপিচ রামানুজস্বামীও জীব ও ব্রহ্ম এক, এই অদ্বৈত-বাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন "—যেমন জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বিদ্যা অবিদ্যা, দ্বন্দ্বভাবে পৃষ্ঠ লগ্ন হইয়া শাস্ত্র সম্মত আছে, তেমনি জীব ও ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যমূলক মহাবাক্য স্থিত ত্বং অর্থাৎ পরমানন্দে পরিপূর্ণ অমৃত সিন্ধু এবং ত্বং অর্থাৎ সংসার ভয়ে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী জীব। অতএব সেই ভিন্ন দুই পদার্থের কখনই একতা হইতে পারে না। বস্তুগত্যা উভয়ের পরস্পর ভেদ ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্ম জগতের অর্চ্চনীয়, তুমি তাঁহার উপাসক দাস। মায়াবাদীদিগের মতে কারণাভাবে ব্রহ্মকে কোন রূপ প্রমাণেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। জগতের কর্ত্তা এবং এই জগৎ যে তাঁহা কর্ত্তৃক, ইহা অনুমান দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। কোথায় সেই হল দত্র কুদ্দালধারী মানবগণ, আর কোথায় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর। বস্তুতঃ এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদের পরিসীমাই নাই। অহো! আমরা যৎপরোনাস্তি অধীন, শ্রমভরে খিদ্যমান, কিন্তু তিনি ভ্রুভঙ্গি করিবামাত্র এই সকল করিতে সমর্থ হন। এবংবিধ প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের একতার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা কখনও সুখী কখনও দুঃখিত হইয়া থাকি, কিন্তু সেই পরমাত্মা পূর্ণ আনন্দময়। পরমাত্মা নিত্য, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, উপাধি শূন্য ও শুদ্ধ সত্য; এবং এই জগতের এক মাত্র সাক্ষী; কিন্তু জীব সে

প্রকার নহে। রে মূর্খ, যিনি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, পরিচ্ছিন্ন হইয়া তিনিই আমি, একথা কোন সাহসে বলিস? মদোন্মত্ত দিগ্‌গজ কি কখন মশকের উদর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে? কতিপয় বাগ্‌বিতণ্ডা পরায়ণ ও কুতর্কসাগরে নিমগ্ন, কুমার্গগামী, মিথ্যা কল্পনাতৎপর, ভ্রান্ত নর, দিগ্‌বিজয়ীর ন্যায় নানা দেশ পরিভ্রমণ করতঃ যথা তথা বলিয়া বেড়ায়, আমিই ব্রহ্ম এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ ব্রহ্মময়। বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি নিত্য পরমেশ্বরের গুণরাশি সত্বে সেই পরমেশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া নৈর্গুণ্যবাদ প্রচার করা কিরূপ ধৃষ্টতার কার্য্য।"

বস্তুত অদ্বৈতবাদ মতে জগৎ এবং ব্রহ্ম এক হইলে পাপ পুণ্যের, পূজ্য পূজকের ভেদ নষ্ট হয়। এই মত পরবর্ত্তী উপনিষদেও দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন। যথা—"

"যত্রহি দ্বৈত মেবভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মভিবদতি, তদিতর ইতরং বিজানতি। যত্রবা অস্য সর্ব্ব মাত্মৈবা ভূত্তৎ কে ন কং জিঘ্রে ত্তৎ কে ন কং শৃণুয়া ত্তৎ কে ন কথমভিবদে ত্তৎ কে ন কং মন্বীত ত্তৎ কে ন কং বিজানীয়াৎ।"

পূর্ব্বোক্ত উপনিষদের বচনে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, যৎকালে দ্বৈতমত অনুভূত হয়, তখনই এক জন অপর জনকে দেখিতে পায়, অপরকে আঘ্রাণ করিতে পায়, অন্যের কথা শুনিতে পায়, অন্য জনকে প্রণাম করে, অন্য জনকে সম্মান করে ও জানে, কিন্তু যদি সকলই আত্মময় হইয়া উঠে তবে কে কাহার বাক্য শ্রবণ, আঘ্রাণ, অভিবাদন ও কে কাহাকে জানিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং ব্যাসের 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বচন দ্বারা পূজা পদ্ধতির মূলে আঘাত করা হয়, কেবল ইহাই নয়; যদি সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তাহা হইলে দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, সচ্চরিত্রতা, সাদ্ধীভাব এ সকল পৃথিবী হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে তিরোহিত হইবে। যথা উপনিষদের উক্তি—

"সকল মিদমহঞ্চ ব্রহ্ম ভূতং যদিসাৎ। ত্বমহং খলু তদাস্যাদাবয়ো রৈক্যমেব। ধন জন সুত দারা মামকানা স্তদাস্যু, র্মম তবয় ভবেযুর্ণাবয়ো রস্তিভেদঃ। ০০০০ নির্ণীত মদ্বৈত মতং ত্বয়া চেৎ বৌদ্ধৈস্তদা কো বিহিতোঽপরাধ।"

• ফলতঃ অদ্বৈতবাদ মতে পরব্রহ্ম নিগুর্ণ, ক্রোধময়, প্রভৃতি রূপে গণ্য হইয়া আমাদিগের ন্যায় ব্যবহার জীবি

হইয়া দাঁড়ান। আমরা সর্ব্ববিৎ জগৎ প্রসবিতাকে নমস্কার করিয়া এমন দূষণীয় মত হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করিতে প্রস্তুত, কেন না তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন—

"সবা অয়মাত্মা কামময়োঽকামোময়ঃ, ক্রোধময়োঽক্রোধময়োঃ ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ।"

এই মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ যে বেদব্যাস স্থাপন করেন তাহার সন্দেহ নাই। বেদান্তের অবিদ্যা এবং সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি এক। তবে প্রভেদ এই যে, বেদান্তদর্শনকার বলেন, ঈশ্বর আত্মশক্তি মায়া সহকারে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন ও সংহার করেন, সত্ত্ব রজঃ তম গুণাক্রান্তা মায়া জড়, তাহাঁর সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতির সৃষ্টি কর্তৃত্ব আছে, বরঞ্চ পুরুষেরই কোনও ক্ষমতা নাই; তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র। বেদান্তদর্শন মতে বেদ ব্রহ্ম কার্য্য ও তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য অনাবৃত, এবং নির্গুণ তাঁহার সজাতীয় কি বিজাতীয় কোন পদার্থ না থাকায় তিনি অদ্বিতীয়। বেদান্তদর্শন মতে বেদ ব্রহ্ম কার্য্য, কিন্তু যখন সেই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণন করিলেন, তখন নির্গুণের বেদ প্রচার আর বন্ধ্যার সন্তান প্রসব উভয়ই সমতুল্য হইয়া দাঁড়ায়।

বেদান্তদর্শন সমগ্র ভারতের পণ্ডিতবর্গের নিকট আদরণীয় হইতে পারে নাই; কেন না অদ্বৈতবাদ মতে পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইতে পারে না, অথচ পৌত্তলিক মতও অতি প্রাচীন। যাঁহার সজাতীয় কি বিজাতীয় সমতুল্য বস্তু নাই, তাঁহার আবার প্রতিমূর্ত্তি কিরূপে নির্ম্মিত হইতে পারে। যাঁহারা সাংখ্যসূত্রের প্রকৃতিবাদ দেখিয়া মহর্ষি কপিলকে নাস্তিকের শিরোমণি বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিবেন, ঐ প্রকৃতিবাদ হইতেই দ্বৈতমত প্রচলিত হইয়াছে। শূন্য পদার্থের চিন্তা করা, আর বায়ুতে মুষ্ট্যাঘাত করা উভয়ই সমান। বেদান্তদর্শন মতে যে ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করা সংসারী লোকের অসাধ্য; বোধ হয় ঋষিদিগের মধ্যেও অতি বিরল। ভারতীয়দিগের যেরূপ ধর্ম্মগত প্রাণ তাহাতে যে তাহারা ধর্ম্মহীন হইয়া অবস্থান করিবে এরূপ সম্ভাবনা অতি অল্প, তাই কতিপয় ঋষি সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রকৃতি পুরুষের ছায়া লইয়া দেব দেবীর আরাধনা পদ্ধতি প্রচলিত করেন। মায়াবাদ ও প্রকৃতিবাদ এতদুভয়ের মধ্যে যে প্রকৃতিবাদ ভারতীয়দিগের বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য তাহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা প্রকৃতিবাদী বলিয়া সাংখ্যদর্শনকে নাস্তিক্যদর্শন বলেন, তাঁহারা ঘোর ভ্রান্ত। বেদান্তদর্শনে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই

পাঁচটী কোষের বিচার এবং অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন পক্ষে ও অনেক তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। যদিও বেদান্তদর্শনে অবিদ্যা বা মায়া প্রভৃতি বাদ রহিয়াছে, তথাপি শ্লাঘার বিষয় এই যে, পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য এই বেদান্তদর্শনের বিচারে পরাভূত করিয়াই বৌদ্ধদিগকে ভারত হইতে বিদূরিত করেন; বৌদ্ধেরা শঙ্করের জটিল তর্কজালে আবদ্ধ হইয়া জালবদ্ধ মীনের ন্যায় ক্ষমতাহীন হইয়া দেশত্যাগী হন। ইহাঁরই প্রগাঢ় চিন্তাঁর ফল স্বরূপ ভারতে পুনারায় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিত হঁয়। শঙ্করাচার্য্য ও বেদব্যাস এক মতাবলম্বী জন্য ব্রহ্ম মীমাংসা সম্বন্ধে অনেক সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বেদান্তদর্শন মহর্ষি বেদব্যাসের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় স্থল।

বেদান্তদর্শনের সার মর্ম্মই যখন জগৎ মিথ্যা, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীবের মুক্তি, তখন এই মত যে উদার ভাবে মানব হৃদয়ে স্থান পাইবে তাহার সম্ভাবনা কোথায়? বোধ হয় তজ্জন্যই তার্কিক উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"জগন্মৃষৈব বেতি ভবন্মতং চেৎ কি কল্পতে ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ।,,

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

—:○:—

তৃতীয় অধ্যায়।

এই দর্শনকারের নাম মহর্ষি কপিল। কিন্তু কপিল নামে অনেক মহর্ষি ছিলেন; তন্মধ্যে সাংখ্য-প্রণেতা কে, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মার পুত্র কপিলের প্রসঙ্গ আছে। তিনিও সাংখ্য শাস্ত্র প্রণায়ক রূপে বিখ্যাত। আবার কপিল নামে বিষ্ণুর অবতার আছেন, এবং সেই কপিল সাংখ্য শাস্ত্র প্রণেতা এমন বর্ণনাও আছে। রামায়ণে ঐ কপিলের প্রসঙ্গে কথিত আছে, যে সগর রাজার ষষ্ঠি সহস্র পুত্র তাঁহার কোপানলে ভস্মীভূত হয়!——

বিভর্ত্তি যো জগৎ কৃৎস্নং, যস্যোৎপত্তির্ন-বিদ্যতে। তেনাশ্ব বাসুদেবেন কপিলেনাপি বাহিতঃ॥ পৃথিব্যাশ্চৈব ভেদোয়ং দৃষ্ট স্তেনেতি মেমতিঃ। সগরস্য চ পুত্রাণাং, বিনা-শোঽমিত তেজসা॥

[বঙ্গীয় রামায়ণ]

ভাগবতে লিখিত আছে মহর্ষি কপিল, মুনিবর কর্দ্দমের ঔরসে তদীয় পত্নী দেবহূতির গর্ভে জন্মপরিগ্রহ

করেন। * কিন্তু বেদব্যাস বলেন, যিনি স্বয়ং পাপ শূন্য হইয়াও কাম্য কর্ম্মরূপে পাপের প্রবর্ত্তন করেন এবং তজ্জন্য যাঁহাকে যতিগণ পরমর্ষি কপিল নামে

---

* কর্দ্দম ও দেবহূতির প্রতি ব্রহ্ম বাক্য যথা—

"বেদাহ মাদ্যং পুরুষ * মবতীর্ণং স্বমায়য়া।
ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে॥
জ্ঞান বিজ্ঞান যোগেন কর্ম্মণা মুদ্ধরন্ জটাঃ।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রো পদাম্বুজঃ॥
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দ্দনঃ।
অবিদ্যা সংশয়গ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি॥
অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচার্য্যৈঃ সুসম্মতঃ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ॥

ভাগবতের বচন দ্বারা বোধ হয় ইনি দ্বিতীয় কপিল, সাংখ্য প্রবচনকার বিজ্ঞান ভিক্ষুও বিষ্ণুর অবতার কপিলকে, সাংখ্যদর্শন লেখক বলেন না, এবং পদ্মপুরাণও পৃথক্ কপিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন যথা—

"কপিলো বাসুদেবাখ্য তত্ত্বং সাংখ্যং, জগাদ হ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্য স্তথৈব চ।
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বংবেদার্থৈ রুপবৃংহিতম্।

নির্দ্দেশ করেন, তাহারও নাম কপিল; ইনি সাংখ্য-দর্শনের প্রবর্ত্তক। মহাভারতের অন্য এক স্থানে কপিলের উল্লেখ আছে, যাঁহার নিকট সূর্য্যরশ্মি গো জঠরে প্রবেশ পূর্ব্বক ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শিবসংহিতাতেও এক কপিলের বর্ণনা আছে, যিনি যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পুনশ্চ বৌদ্ধদিগের ইতিহাসেও কপিল মুনির প্রসঙ্গ আছে। তাঁহারা কহেন, ইক্ষ্বাকু বংশে ইক্ষ্বাকু বিরোধক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। তিনি প্রথমা মহিষীর পরলোক হওয়াতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সেই দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তানকে রাজ্য দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায়, প্রথম পক্ষের কুমারগণকে নির্ব্বাসিত করেন। নির্ব্বাসিত কুমারেরা

সর্ব্ব বেদ বিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহন্যো জগাদ হ।
সাংখ্যমাসুরয়েহন্যস্মৈ কুতর্ক পরিবৃংহিতমিতি।"

বিশেষতঃ—

এতন্মে জন্ম লোকেহস্মিন্ মুমুক্ষুণাং দুরাশয়াৎ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বনাং সম্মতায়াত্মদর্শনে॥
এষ আত্মপথো হব্যক্তো নষ্টঃ কালেন ভূয়সা।
তং প্রবর্ত্তয়িতুং দেহ মিমং বিদ্ধি ময়া ভৃতম্॥

সহোদরা পাঁচটি ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কপিল মুনির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হন। ঐ কপিল মুনি তাৎকালিক বোধিসত্ত্ব ছিলেন, এবং পরে গোতম বুদ্ধ হইয়াছিলেন। কপিলের আদেশানুসারে রাজকুমারেরা অগ্রজা ভগিনীটি কে পরিবর্জ্জন করিয়া, অনুজা চতুষ্টয়াকে চারি ভ্রাতা বিবাহ করেন, এবং ঐ স্থানের নাম কপিলাবস্তু নগর রাখেন। বহুকাল পরে ঐ নগরে তাঁহাদের বংশে সিদ্ধার্থ বুদ্ধ শাক্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন। যিনি শেষ মর্ত্ত বুদ্ধ।

সাংখ্য-শাস্ত্র-রচক কপিলের এইরূপ নানা পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সাংখ্য-সূত্র লেখক কে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ইনি স্পষ্টতঃ প্রকৃতিবাদী, তজ্জন্য তাঁহার প্রণীত দর্শনকে নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন কহে। মহর্ষি কপিল প্রকৃতিবাদী হইয়াও বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না।

সাংখ্য সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ২০ হইতে ২৪ সূত্র পর্য্যন্ত অবিদ্যাবাদ খণ্ডন, ১৫০ ও ১৫১ সূত্রে একাত্মবাদ খণ্ডন, ২৫ সূত্রে লিখিত আছে,—ন বয়ং ষট্ পদার্থ বাদিনঃ বৈশেষিকাদিবৎ, আবার ২৭ সূত্রে বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডনও আছে। উক্ত অধ্যায়ের ৯২।৯৪ সূত্রকে তামস সূত্র কহে, কেন না ঐ সূত্রদ্বয়ে বিশ্বস্রষ্টা পরমাত্মার অত্যন্তাভাব যথা—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ উভয়থাপ্যসৎ করত্বং।"

কপিলের মতে প্রবৃত্তি-পরবশ হইলে কোন পুরুষ যথার্থ মুক্তাত্ম হইতে পারেন না, একারণ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নাই, তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র। তিনি আরো কহেন, প্রবৃত্তি ব্যতীত পুরুষের কার্য্য অসম্ভব, অতএব প্রবৃত্তি-পরবশ না হইলে পুরুষ জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না। কিন্তু প্রবৃত্তি-পরবশ হইলে তাঁহার বন্ধন নিশ্চয় ও মোক্ষের হানি হয়, সুতরাং শক্তিরও হানি, কেন না বদ্ধাত্মার দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভ। প্রবৃত্তি থাকিলে শক্তি থাকে না, শক্তিমান্ মুক্তাত্ম হইলে প্রবৃত্তি থাকে না, অতএব সৃষ্টিকার্য্যে পুরুষের ইচ্ছা হইলেও শক্তি থাকে না, শক্তি থাকিলেও ইচ্ছা হয় না।

কপিলের মতে কেবল বিজ্ঞান দ্বারা সাংসারিক ত্রিতাপের মোচন সম্ভাব্য, সেই বিজ্ঞান লাভের তিনটী উপায়—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি এবং শব্দ। তাঁহার মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থ জিজ্ঞাস্য। আদি পদার্থ প্রকৃতি, অন্ত্য পদার্থ পুরুষ। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই নিত্য। তদ্ভিন্ন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ত্রয়োবিংশতি পদার্থ যথা—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র ইত্যাদি। বোধ হয় মহর্ষি কপিলের মত গ্রহণ করিয়া মৎস্যপুরাণে প্রকৃতির সৃষ্টি-ক্রিয়া ও গুণরাশি লিখিত হইয়াছে.—

"সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণ-ত্রয়ের সাম্যাবস্থায় অবস্থানের নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতেই প্রজা সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই মহত্তত্ত্ব ইহলোকে মহান্ নামে বিখ্যাত। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার-তত্ত্বের উৎপত্তি। অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে বুদ্ধির অনুগত পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং কর্ম্মের অনুগত পঞ্চ ইন্দ্রিয় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধীন্দ্রিয় যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা;—কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও বাক্। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—বুদ্ধীন্দ্রিয়ের। আর উৎসর্গ, আনন্দ, আদান, গতি, আলাপ—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের। মন একাদশ ইন্দ্রিয় ও উভয়াত্মক। ইহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সমুদয় গুণই আছে। মন সিসৃক্ষা হেতু প্রেরিত হইয়া সৃষ্টিকে বিকৃত করে। শব্দ তন্মাত্র বিকৃত হইয়া শব্দ-গুণাত্মক আকাশের সৃষ্টি হয়। আকাশ বিকৃত হইয়া শব্দ স্পর্শ গুণাত্মক বায়ুর উৎপত্তি হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ—এই ত্রিগুণাত্মক তেজের সৃষ্টি হয়। তেজ বিকৃত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস—এই চতুর্গুণাত্মক জল উৎপন্ন হয়, এই জল, জল তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হওয়াতে ইহার রস গুণই অধিকাংশ। গন্ধ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চগুণময়ী ভূমির উৎপত্তি হয়, উক্ত তত্ত্ব সমুদায়ের মধ্যে পুরুষ পঞ্চবিংশ হইতেছেন। এই

৪

পুরুষ স্বাধীন নহেন।” মৎস্য পুং, ৩য় অং, অবিকল সাংখ্যদর্শন।

অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ আছে, যথা—

প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহু রবিশেষং বিশেষবৎ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভি র্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দ্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ।
মহাভূতানি পঞ্চৈব ভূরাপোঽগ্নির্ম্মরুন্নভঃ।
তন্মাত্রাণি চ তাবন্তি গন্ধাদীনি মতানি মে॥
ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্র, ত্বগ্, দৃগ্, রসন, নাসিকাঃ।
বাক্ করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে॥
মনো বুদ্ধি রহঙ্কার শ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্দ্ধা লক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যা লক্ষণ রূপয়া॥
এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ॥
প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতোভয়ম্।
অহঙ্কার বিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ॥ * * *
দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ-
পুমান্। আধত্তবীর্য্যং সাসূত মহত্ত্বত্বং হিরন্ময়ম্॥

বিশ্ব মাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটৌস্থ জগদঙ্কুরঃ।
স্বতেজ সাপিবৎ তীব্র মাত্ম প্রস্বাপনং তমঃ॥

তৃতীয় স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন লেখক মহর্ষি কপিল তাঁহার দর্শনে বেদ বিষয়ে কোন তর্ক উপস্থিত করেন নাই। পূর্ব্ব হইতেই তিনি বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না। তিনি জ্ঞান বলে জানিতেন, অদ্য বর্ণাশ্রম বিরোধী হইয়া বেদ অমান্য করিলে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। তাই অতীব কাতরভাবে লিখিলেন যে, মুক্ত কিম্বা বদ্ধ কোন ব্যক্তি এমন গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না, অতএব উহা অপৌরুষেয়। যথা—

"ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ। মুক্তামুক্তয়োরযোগ্যত্বাৎ।"

কিন্তু বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলে বোধ হয়, মহর্ষি কেবল সমাজ রক্ষার জন্য ঐরূপ সূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেন না মুক্ত ব্যক্তির গ্রন্থ রচনার বাসনা হইতে পারে না, আর অমুক্ত ব্যক্তি কখন সর্ব্বজ্ঞ কি সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে না, এ বিষয়ে বিজ্ঞান ভিক্ষুও এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—

"জীবন্মুক্ত ধুরীনো বিষ্ণু র্বিশুদ্ধ তয়া নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞোঽপি বীতরাগত্বাৎ সহস্র শাখ-

বেদ নির্ম্মাণাযোগ্যঃ। অমুক্ত স্তু সর্ব্বজ্ঞত্বা দেবাযোগ্য ইত্যর্থ।" বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য।

তিনি আরও বলেন, আদি পুরুষ যদি এরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি বেদের কর্ত্তা হইতে পারেন না। যথা—

"যস্মিন দৃষ্টেপি কৃত বুদ্ধি রুপজায়তে তৎ পৌরুযেয়ং। ন পুরুষোচ্চরিত মাত্রেণ, পৌরুষেয়ত্বং শ্বাস প্রশ্বাসয়োঃ সুষুপ্তি কালীনয়োঃ পৌরুষেয়ত্বব্যবহারাভাবাৎ কিন্তু বুদ্ধি পূর্ব্বক ত্বেন বেদস্তু নিশ্বাস বদেবা দৃষ্ট বিশাদ বুদ্ধি পূর্ব্বকা এব স্বয়ম্ভুবঃ সকাশাৎ স্বয়ং ভবন্তি।" বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য।

মহর্ষি কপিলের মতে বেদ অদৃষ্টবশাৎ আপনি হইয়াছে। তিনি বলেন বেদ নিত্য নহে, কাহারও কৃত নহে, তবে কার্য্য বটে, তাহাও পুরুষের কার্য্য নহে, উহা আপনি হইয়াছে এবং বেদের প্রমাণ স্বয়ং বেদ ভিন্ন অপর কেহ নহে।

"নিজশক্ত্যভিব্যক্তঃ স্বতঃ প্রামাণ্যং,
ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্ব শ্রুতে।"

এক্ষণে সাংখ্যদর্শন সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহর্ষি কপিল মুক্তকণ্ঠে তারস্বরে স্বতন্ত্র প্রকৃতিকেই জগৎকর্ত্রী কহিয়া পুরুষের অধিষ্ঠান অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যথা—

"প্রকৃতির্বাস্তবা পুরুষস্যাধ্যাস সিদ্ধিঃ। অন্যযোগেঽপি তৎসিদ্ধির্নাঞ্জস্যেনায়োদাবৎ। অচেতনত্বেপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য। কর্ম্মবদ্দৃষ্টের্ব্বা কালাদেঃ প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ নিত্যত্বেপি নাত্মনঃ যোগ্যত্বাভাবাৎ। সর্ব্বত্র কার্য্য-দর্শনাৎ বিভুত্বং। সাংখ্য সূত্র।

অর্থাৎ প্রকৃতিই বাস্তবিক কারণ, পুরুষের কারণত্ব অধ্যাস মাত্র। প্রকৃতি সংযোগ হইলেও পুরুষে কারণত্ব নাই, যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহের দাহিকা শক্তি হয় না, তদ্রূপ প্রকৃতি অচেতন হইলেও তৎকার্য্যে কোন বাধা নাই, যেমন দুগ্ধ আপনি দধির আকারে পরিণত হয়। প্রকৃতিই আদ্য উপাদান, অন্য সকলের কার্য্যরূপ বর্ণনা শ্রুত হইয়াছে। পুরুষ নিত্য বটেন, কিন্তু ক্ষমতাহীন হওয়াতে কোন্ কার্য্যকারী নহেন, প্রকৃতির কার্য্য সর্ব্বত্র আছে, তন্নিমিত্ত প্রকৃতির বিভুত্ব।

ভাগবতোক্ত সাংখ্য মতে এইরূপ, যথা—

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ। তদৃচ্ছয়ৈ বোপগতা মভ্যপদ্যত লীলয়া॥ গুণৈর্ব্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাং প্রকৃতিং প্রজাঃ। বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ সইহ জ্ঞানগূহয়া॥ এবং পরাভি ধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্। কর্ম্মসু ক্রিয়মানেষু গুণৈ রাত্মনি মন্যতে॥ তদসঃ সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্রংঞ্চ তৎকৃতম্। ভবত্য কর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্ব্বিতাত্মনঃ॥ কার্য্যকারণকর্তৃত্বে করণং প্রকৃতিং বিদুঃ। ভোক্তৃত্বে সুখ দুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্॥ তৃতীয় স্কন্ধ।

বেদান্তদর্শন প্রণেতাও ঠিক্ এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তবে কপিল স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন বাদরায়ণ কৌশলে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—

"অজামেকাং লোহিত শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বী প্রজাঃ জনয়ন্তী সরূপাম্।
অজোহ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যা॥"

অর্থাৎ এক অজ সংযুক্ত হইয়া লোহিত, কৃষ্ণ, শুক্ল এবং বহুল সরূপ প্রজা উৎপাদিকা এক অজাকে ভোগ করেন,

অন্য অজ ভুক্তভোগ্যা অজাকে ত্যাগ করেন। এস্থলে লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণা, অজা শব্দে সত্ব, রজ, তমো গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রকৃতিকেই বুঝায়, এবং তদ্দ্বারা জগৎ-সৃষ্টি সূচিত হইয়াছে। মহর্ষি কপিল প্রকৃতিকে সর্ব্ব মূলের মূলে আদি মূল কহিয়াছেন। তিনি মীমাংসা করিয়াছেন আত্মা (পুরুষ) নিত্য শুদ্ধ এবং মুক্ত, তাঁহাতে বিকার নাই, তবে তিনি কিরূপে অচেতন জড় পদার্থের উপাদান হইতে পারেন? নিত্য মুক্ত আত্মারি কি বিকার সম্ভবে? আর যদিও বিকার সম্ভবে তবে কি তাঁহা হইতে অচেতন জড় পদার্থের সম্ভব হইতে পারে? জগৎকে আত্মাজাত করিলে এই বলা হয় যে, শুদ্ধের পরিণামে অশুদ্ধ উৎপন্ন হইল। সুতরাং সৃষ্টির দ্বারা কারণের অপকর্ষ প্রাপ্তি হইল। উত্তম বীজ হইতে উৎপন্ন তরুর শাখা পল্লব কখন হীনশ্রী ও ফল অপকৃষ্ট হইতে পারে? সচেতন পদার্থ হইতে কি অচেতন বস্তু উৎপন্ন হয়, বরঞ্চ অচেতন হইতে সচেতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে, প্রমাণ দংশ মশকাদি।

এ সূত্রের মীমাংসায় পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যও পরাস্ত হইয়াছেন। যদিও তিনি সমুদায় স্বীকার না করুন তথাপি ইহার মূলরে পৃষ্ঠপূরক হইয়াছেন, যথা—"যতঃ-ক্ষীরবৎ দ্রব্য—স্বভাব বিশেষাদুপপদ্যতে যথাহি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধি হিম ভাবেন পরিণমতেহনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি।" শঙ্করভাষ্য।

অর্থাৎ আত্মার স্বয়ং কর্তৃত্ব দুগ্ধবৎ, দ্রব্য স্বভাব বিশেষ বশতঃ উপপন্ন হয়, সংসারের মধ্যে যেমন দুগ্ধ বাহ্য সাধন উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং হিম এবং দধিরূপে পরিণত হয়, আত্মার কর্তৃত্বও তদ্রূপ। কপিলের মত ও শঙ্করের অদ্বৈত মত উভয়ই এক্ প্রকার। কপিল কহেন প্রকৃতির কার্য্যের তাৎপর্য্য পুরুষের মুক্তি সংকল্প। যথা—

"বিমুক্ত মোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য প্রধান সৃষ্টিঃ পরার্থং।

স্বতোপ্যভোক্তৃত্বাদুষ্ট্রকুঙ্কুম বহনবৎ নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ।" সাংখ্যকারিকা।

অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্য বিমুক্ত মোক্ষার্থ অথবা আত্মার্থ, প্রকৃতির সৃষ্টি পরার্থ। প্রকৃতি আপনি ভোক্তা নহেন। উষ্ট্র যেমন কুঙ্কুম বহন করে, চরিতার্থ হইলে নর্ত্তকীর নিবৃত্তির ন্যায় প্রকৃতির নিবৃত্তি। বিমুক্ত বিবিক্ত আত্মা সংসার ভোগে নিবৃত্তি হওয়াতে প্রকৃতির সৃষ্টি নিবৃত্তি। অপর সূত্রে ইহা অপেক্ষাও বিশদরূপে অর্থ স্ফুটিত করিয়াছেন, যথা——

"পুরুষার্থং করণোদ্ভবোপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ ধেনুবদ্বৎসায়, বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা

প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য। পুরুষ বিমোক্ষ নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তি প্রধানস্যং॥"

অর্থাৎ প্রকৃতি অচেতন হইয়াও অভ্যাস বশতঃ আত্ম-কার্য্য সম্পন্ন করেন। চৈতন্য না থাকিলেও কার্য্যশক্তি আছে, যেমন বৎসার্থ গাভীর দুগ্ধক্ষরণ হইয়া থাকে, স্রোত-স্বতী যেমন মানবের হিতার্থে নিম্নগা হয়, তদ্রূপ পুরুষের নিঃশ্রেয়সার্থ প্রকৃতি জগৎকর্ত্রী হন।

তাঁহার মতে প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। পুরুষের কার্য্য তৎপরতা সম্ভবে না। প্রকৃতির কার্য্য অহঙ্কারে ক্রিয়া তৎপরতা সম্ভবে, পুরুষে সম্ভবে না। যথা—

"অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ।"

শঙ্কর অবিদ্যার আরোপ করেন; কিন্তু মহর্ষি কপিল অযুক্ত উপদেশ দানে কাতর হইয়া লিখিয়াছেন যে, জগৎ অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি, এবং পুরুষ নিঃসঙ্গ। অত-এব নিঃসঙ্গ পুরুষ জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না। যথা—

"নাবিদ্যাযোগো নিঃসঙ্গস্য।
তদ্যোগে তৎ সিদ্ধাবন্যোন্যাশ্রয়ত্বং॥"

বস্তুতঃ সাংখ্যদর্শন পুরুষের কোন কার্য্য স্বীকার করেন না। পুরুষ নিত্য-মুক্ত কার্য্য করি-প্রবৃত্তি-পরবশ নহেন। শরীর ও মন যাহা প্রবৃত্তির স্থান তাহার সহিতও তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ নাই। শরীর এবং মনের সহিত পুরুষের

যে নৈমিত্তিক সম্বন্ধ তৎপ্রযুক্ত—তিনি ক্রিয়াবাণ রূপে প্রতীয়মান হন, যেমন জবা-কুসুমসংযোগে নির্ম্মল স্ফটিক রক্তবর্ণ বোধ হয়। শারীরিক এবং মানসিক কার্য্যেতে পুরুষ আসক্ত কিম্বা বদ্ধ হয়েন না। ক্ষণকাল মাত্র মনের সন্নিহিত, সেই কারণ আসক্তি এবং বন্ধনের আভাস, কিন্তু প্রবৃত্ত্যাদি মনের বিকার মাত্র—পুরুষের নহে। যথা—

"কুসুমাৎ মণিঃ। তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি। ন কর্ম্মণান্য-ধর্ম্মত্বাদতিপ্রসক্তেশ্চ জবাস্ফটিকয়োরিব নোপ-রাগঃ কিন্ত্বভিমানম্।" সাংখ্যকারিকা।

আর এই নৈমিত্তিক সম্বন্ধ প্রযুক্ত যে সঙ্গাভাস তাহা পদ্ম পত্র গত জল-তুল্য, যথার্থ সঙ্গ নহে এবং সে সঙ্গা-ভাসও নিত্য নহে। যথা—

"শ্রুতি-স্মৃতিষু পদ্ম পত্রস্থ জলেনেব পদ্ম পত্রস্যাসঙ্গতায়াঃ পুরুষ সঙ্গতায়াং দৃষ্টান্ত তা শ্রবণাচ্চ।"

সাংখ্য মতে পুরুষ—উদাসীনসাক্ষী, কেবল,—মধ্যস্থ,—দ্রষ্টা, এবং—অকর্ত্তা।

গুণ সমূহের কর্ত্তৃত্ব আছে, সাক্ষীর প্রবৃত্তি নিবৃত্তি

কিছুই নাই। পুরুষ উদাসীন মাত্র, গুণেরই কর্তৃত্ব, পুরুষের কর্তৃত্বাভাস। গুণের কর্তৃত্ব প্রযুক্ত পুরুষের কর্তৃত্বাভাস হয়। যথা—

"তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য কৈবলং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ। গুণাঃ এব কর্ত্তারঃ প্রবর্ত্তন্তে সাক্ষী ন প্রবর্ত্ততে নাপি নিবর্ত্ততে এব।" সাংখ্যকারিকা।

মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে উপদেশ করিয়াছেন যে, ঈশ্বর অসিদ্ধ। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে বদ্ধ বা মুক্তের অন্যতর হইবেন। যদি মুক্ত হয়েন তবে রাগাদি প্রবৃত্তিরহিত, সুতরাং কার্য্যাক্ষম, যদি তাঁহাতে রাগাদি প্রবৃত্তি থাকে তবে তিনি মুক্তাত্মা নহেন, বদ্ধাত্মা। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন শক্তি হইতে পারেন না। তবে শাস্ত্রের মধ্যে যে ঈশ্বরবাচক শব্দ আছে তাহা কেবল চাটূক্তি মাত্র, অর্থাৎ মুক্তাত্মার প্রশংসা; অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি জন্য দেবতার উপাসনা মাত্র। যথা—

"মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। সিদ্ধস্য ব্রহ্মা-বিষ্ণুহরাদেরেবানিত্যেশ্বরস্যাভিমানাদি মতোপি গৌণনিত্যত্বাদি মত্বানিত্যত্বাদ্যুপাসা পরা।" সাংখ্যকারিকা।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বরের অভাবে বেদ

কি প্রকারে হইতে পারে, ইহার উত্তরে কপিল মীমাংসা করিয়াছেন যে, বেদ-বাক্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ হওয়াতে আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় প্রমাণ। মহর্ষি কপিল উপদেশ করিয়াছেন যে বিজ্ঞানই অপবর্গের অমোঘ উপায়; কিন্তু রাগ-দ্বেষাদি চিত্তবিকার বিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, তন্নিমিত্ত ধ্যান অবলম্বন করিয়া রাগ দ্বেষের দমন এবং মনের শান্তি ও বিজ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তিনি ধ্যানের অর্থ করিয়াছেন যে, ধ্যান চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ ধ্যায়ের অতিরিক্ত বৃত্তি নিরোধ, তাহা বিশেষ প্রকারে উপবেশন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, দমন ও জাতীয় ধর্ম্মরক্ষা এবং বৈরাগ্য দ্বারা সম্ভবে। যথা—

"রাগোপহতির্ধ্যানং, জ্ঞান-প্রতিবন্ধকো যো বিষয়োপরাগ-শ্চিত্তস্য তদুপঘাতহেতুর্ধ্যানং বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ধ্যেয়াতিরিক্ত-বৃত্তি-নিরোধ-রূপেণ সম্প্রজ্ঞাতযোগেন তৎসিদ্ধি-র্ধ্যানস্য নিষ্পত্তি-জ্ঞানাখ্যফলোপধানরূপা ভবতি। ধারণাসন স্বকর্ম্মণা তৎসিদ্ধিঃ। নিরোধ-শ্ছর্দ্দি-বিধারণাভ্যাং। স্থিরসুখমাসনং। স্বকর্ম্ম স্বাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানং। বৈরাগ্যা-দভ্যাসাচ্চ॥" সাংখ্যকারিকা।

সংসার এবং সংসারস্থ সমস্ত পদার্থ অসার এবং মিথ্যা—মহর্ষি কপিলের এই সার কথা; বাস্তবিক কথাও যথার্থ তাহার সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে, সাংখ্যদর্শনই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ভিত্তি কপিল—নিরীশ্বর, বুদ্ধদেবও—নিরীশ্বর, কপিল সংসার দুঃখে কাতর, বুদ্ধদেবও কাতর। কপিল বলেন,—দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্ম্ম, কর্ম্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ অজ্ঞানতা, বুদ্ধদেবেরও ঠিক এই মত। ফলতঃ বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকত্ববাদ সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন।

কেবল সাংখ্যকার মহর্ষি কপিলই যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এমত নহে, লোকায়তমত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতিও তাঁহার পূর্ব্বতন তাহার সন্দেহ নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—"বৃহস্পতি গায়ত্রী দেবীর মস্তকে পদাঘাত করেন তাহাতে গায়ত্রীর মস্তক চূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু গায়ত্রী অমর তজ্জন্য প্রত্যেক খণ্ড মস্তিষ্ক বসা হইতে এক একটী বষট্‌কার দেবের উৎপত্তি হয়।" অন্য স্থলে লিখিয়াছেন।—

"ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তরো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশা চরাঃ"

তখন তাঁহাকর্তৃক যে সর্ব্ব প্রথমে এই ব্রহ্ম ভূমিতে নাস্তিক্য মত প্রচারিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইনি শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তিকেই প্রশস্ত বলিয়া গিয়াছেন।—

কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যোঽর্থনির্ণয়,
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে।

এক্ষণে মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া যে সকল সূত্র গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন তাহার আনুপূর্ব্বিক সূত্র গুলি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে " ফলনিষ্পত্তিঃ—কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।

আবশ্যকেন কর্ম্মণৈব ফল-নিষ্পত্তি-সম্ভবাৎ।

স্বোপকারাদধিষ্ঠানং লোকবৎ।—লৌকিকে-শ্বরবদিতরথা। পারিভাষিকোবা।

সংসারসত্ত্বেপি চেদীশ্বরস্তর্হি সর্গাদ্যুৎ-পন্ন-পুরুষে পারিভাসমাত্রমস্মাকমিব ভবতামপি স্যাৎ।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ।
তদ্যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ। রাগস্তূৎকটেচ্ছা।
প্রধান-শক্তি-যোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ।
সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যং।
প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।

ঈশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তি।
সম্বন্ধাভাবন্নানুমানুং
শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য।”

পঞ্চম অধ্যায়—সাংখ্যদর্শন।

অর্থাৎ ফল-নিষ্পত্তি ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দ্বারা হয় না, তাহা কর্ম্ম দ্বারা হয়, আবশ্যক কর্ম্ম দ্বারা। ঈশ্বরের যদি কার্য্য-শক্তি থাকে তবে অভিপ্রায়ও থাকিবে; কিন্তু অভিপ্রায় তাৎপর্য্য থাকিলে তিনি সাংসারিক ঈশ্বর হইবেন। সাংসারিক ঈশ্বর অজ্ঞানের বিড়ম্বনার্থ কেবল পরিভাষা মাত্র। রাগ-বিরহে সৃষ্টি সম্ভবে না, কিন্তু রাগ থাকিলে নিত্য মুক্তত্বের হানি হয়। রাগের অর্থ উৎকট ইচ্ছা; ঈশ্বরে যদি উৎকট ইচ্ছা সম্ভবে তবে তিনি আমাদের ন্যায় বিষয়াসক্ত হইলেন। তাঁহার সত্তা আছে বলিয়া যদি তাঁহাকে ঈশ্বর বল, তবে সকল পদার্থকেই ঈশ্বর কহিতে হইবে। অতএব প্রমাণাভাবে ঈশ্বর সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বর বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো নাই। অনুমান প্রমাণও সম্ভবে না, কেন না সম্বন্ধাভাব। এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণে প্রকৃতিই সিদ্ধ হয়।

এই সাংখ্যদর্শন কোন সময়ে রচিত হয় তাহার প্রমাণাভাব। কেবল সূত্র সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন।—

এতৎ পবিত্র মগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনু কম্পয়া প্রদদৌ, আসুরিরপি পঞ্চ শিখায়, তেন চবহুধা কৃতং তন্ত্রং। ৭০ কারিকা।

ঋষি দয়া করিয়া এই প্রধান পবিত্র শাস্ত্র প্রথমে আসুরিকে দিয়াছিলেন, আসুরি পঞ্চশিখকে, পঞ্চশিখ ইহাকে বহু বিস্তীর্ণ করিয়াছেন। মহাভারতে লিখিত আছে মিথিলাধিপতি জনকের নিকট কপিলা পুত্র পঞ্চশিখ উপস্থিত হইয়া সাংখ্যযোগ বিষয়ক অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। এই মহাত্মা আসুরীর সর্ব্বপ্রধান শিষ্য।

সাংখ-দর্শন-কার কপিল এইরূপে আপন মত বিবৃত করিয়া স্পষ্টরূপে জগৎকে দেখাইয়াছেন। এই সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি এবং পুরুষ বাদ লইয়াই পুরাণ-রচকেরা স্ব স্ব পুরাণে দেব-দেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতিকে জগন্মাতা ও পুরুষকে জগৎপিতা স্থির করিলেন। কেন না শিব-পুরাণ-রচক স্পষ্টতঃ পুরুষকে উদাসীন বলিয়া গিয়াছেন যথা।—

"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থবিদঃ প্রভো।"
"ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ প্রবর্ত্তিনীম্।
তদ্দর্শিন মুদাসীনত্বামেব পুরুষং বিদুঃ।"

এইরূপে প্রকৃতি এবং পুরুষকে মাতা পিতা কল্পনা

করিয়া জগতের স্রষ্টা স্রষ্ট্রী পদে অভিষিক্ত করিলেন। শৈবেরা মহাদেবকে জগৎকর্ত্তা পুরুষ ও পার্ব্বতীকে জগৎ-কর্ত্রী প্রকৃতি সাজাইলেন।

অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবতকার সেই উদাসীন পুরুষকে কৃষ্ণ ও গোপ-কন্যা রাধিকাকে প্রকৃতি সাজাইয়া ভারত-রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন।

শৈবগণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগতকার বিশেষ কৌশলে আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এমন কি উহাতে দর্শনের পরিসীমা, কাব্যের উচ্চতর প্রাণ একাধারে সম্মিলিত থাকায় রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন মতে ঐ প্রণয় অপবিত্র না হইয়া আরো প্রগাঢ় ভাব প্রকাশ করে, কেন না সাংখ্যদর্শন মতে জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরে আসক্ত, যেমন পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্ফটিকপাত্রে জবা কুসুমের আভারতুল্য। কিন্তু যৎ-কালে ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের বিচ্ছেদ তখনই জীবের মুক্তি। ইহা অতীব প্রগাঢ় বিষয়, সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানপথাতীত, তাই ভাগবতকার দর্শন ও কাব্য একত্র মিলাইয়া পুরুষকে স্বীয় কাব্য মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও প্রকৃতিকে রাধা সাজাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের আসক্তি বাল্যলীলায় এবং এতদুভয়ের সম্বন্ধ বিচ্ছেদে যে জীবের মুক্তি তাহাও দেখাইলেন, সাংখ্যদর্শন মতে ইহা-দিগের মিলনই দুঃখের মূল, তাই কবি অপবিত্র করিয়া

রাধাকৃষ্ণের লীলা দেখাইলেন। বস্তুতঃ প্রমাণ—আত্মার ইতিহাস, প্রকৃতির সহিত পুরুষের মিলন, পরে বিচ্ছেদ, পরে মুক্তি।

পুরাণ-রচকেরা প্রায়ই ঈশ্বরকে মানব অবতার কল্পনা করিয়া মৎস্য কূর্ম্মাদি দশ অবতার লিখিয়া গিয়াছেন। এবং এক এক অবতারে এক একটীর বিশেষ কারণ দেখাইয়াছেন। যৎকালে প্রলয় পয়োধি-জলে সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত ছিল, তখন বেদ উদ্ধার নিমিত্ত বিষ্ণুর মৎস্যাবতার পরিকল্পিত হইয়াছে, যাহা হউক, মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে—

"গুণেভ্যঃ ক্ষোভ্যমানস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম বিজিজ্ঞিরে
একাদেবাস্ত্রয়োভাগা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।"

দেখা যাইতেছে পূর্ব্বোক্ত গুণের ক্ষোভ কেবল স্বত্বঃ রজঃ তমোগুণের ক্ষোভ মাত্র ; আর তাহা হইতেই ত্রিদেবের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ গুণ প্রকৃতি ও পুরুষের সংসক্তাবস্থা। বিচ্ছেদ হওয়াতেই সৃষ্টিকামনা এবং তাহা হইতেই পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইয়াছে। পরে (সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণে রূপকল্পনা) বচন রচনা করিয়া ভারত-রঙ্গভূমিতে দেব-লীলার অভিনয় আরম্ভ করিলেন। এই সাংখ্যদর্শন-কার প্রমাণাভাবে যদিও স্পষ্টতঃ ঈশ্বরস্তিত্বে সন্দিগ্ধ তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কপিলের মহিমা অনেক সেশ্বরবাদিরাও মুক্তকণ্ঠে লিখিয়া গিয়াছেন।

"তৎকারণং সাংখ্য যোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্ত মগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ॥"

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

ধন্য বিজ্ঞান পাণ্ডিত্য! ঈশ্বরবাদী মহামতি ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট সাংখ্যযোগের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

সাংখ্য মতাবলম্বীরা কহিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যিনি সমুদায় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, তিনি দেহ নাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে সমর্থ হন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐরূপ মুক্তি লাভকে সাংখ্যমতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! এই উভয়বিধ যুক্তি উভয়পক্ষ সমর্থক হিতবাক্য ও শিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণ করা ভবাদৃশ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু সাংখ্যমত শাস্ত্র প্রমাণ। এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধু সম্মত। শাস্ত্রানুসারে ঐ উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ করিতে পারা যায়। এই উভয় মতেই পবিত্রতা অবলম্বন জীবগণের

প্রতি দয়া প্রকাশ ও নানা বিধ ব্রত ধারণ করা বিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ঐ উভয় মতের শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথ সমান নহে।

মহামতি মনীষিগণ এই সাংখ্যমতকে অক্ষর, ধ্রুব, পূর্ণ-ব্রহ্ম, সনাতন, নির্দ্দন্দ্ব, নির্ব্বিকার, নিত্য, এবং আদি, অন্ত ও মধ্যবিহীন বলিয়া কীর্ত্তন করেন, ইহা যোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় উপস্থিত হয়। পরমর্ষিগণ শাস্ত্র মধ্যে সাংখ্যমতকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, সাংখ্যমতাবলম্বী, ও শান্তি গুণাবলম্বীব্যক্তিগণ যে পরমাত্মার নিয়ত স্তব করিয়া থাকেন, সাংখ্যশাস্ত্র সেই নিরাকার পরমব্রহ্মের মূর্ত্তি-স্বরূপ।

এই অবনীতে স্থাবর ও জঙ্গম এই দুই প্রকার পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে জঙ্গম পদার্থই শ্রেষ্ঠ। বেদ, যোগ, শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণে যে লৌকিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের কথা দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে সমস্তই সাংখ্যমত হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে শান্তি, বল, সূক্ষ্মজ্ঞান, তপস্যা ও সুখের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যমতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য সকলের সম্যক্‌রূপ অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলেও তাঁহাদিগের অধোগতি হয় না। প্রত্যুত তাঁহারা সুর-লোকে পর্য্যটন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকুলে

জন্মপরিগ্রহ করেন। যাঁহারা সাংখ্যমতাবলম্বী হইয়া জ্ঞানানুসন্ধানে যত্নবান হন, তাঁহারা জ্ঞানের সম্যক্ উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে তির্য্যক্ যোনিতে গমন, অধঃপতন বা পাপত্মাদিগের সহিত সহবাস জনিত ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। যিনি মহাসাগর সদৃশ অতি বিশাল এই পুরাতন সাংখ্যমত সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই নারায়ণ স্বরূপ।

প্রকৃতিবাদী সাংখ্যবিশারদ পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন যে, প্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহ-ঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত উৎপন্ন হয়। সাংখ্যবাদীরা এই আটটীকেই প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশ আদি পঞ্চভূত, ও মন এই ষোড়ষটী ঐ আট প্রকৃতির বিকার। যে পদার্থ হইতে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সেই পদার্থে লীন হইয়া থাকে। তরঙ্গমালা যেরূপ ক্রমশঃ সাগরে সমুৎপন্ন হইয়া সাগরেই বিলীন হইয়া যায়।

অব্যক্ত প্রকৃতি যেরূপ দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টি সময়ে বিবিধ রূপ ও প্রলয় সময়ে এক রূপ প্রাপ্ত করায়, তদ্রূপ জীবাত্মাও সৃষ্টিকালে প্রকৃতির বহু রূপ ও প্রলয়কালে এক রূপ উৎপাদন করিয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মার

দেহকে ক্ষেত্র এবং অধিষ্ঠাতা পুরুষকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জীবাত্মা ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত হইয়া তাহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তন্নিবন্ধন তিনি অধিষ্ঠাতা পুরুষ ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর ভিন্ন। পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকে ক্ষেত্র, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত আত্মাকে জ্ঞাতা, জ্ঞানকে জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন ও প্রকৃতির কার্য্য এবং জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতিকে অব্যক্ত ক্ষেত্র ও ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সাংখ্যবিদ পণ্ডিতগণ প্রকৃতিকেই জগৎ সৃষ্টির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যে শাস্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকেই সংখ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

মহর্ষি কপিল বেদ প্রমাণ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন ঈশ্বরাভাব তখন বেদের প্রামাণ্য কোথায় রহিল। অতএব সাংখ্যদর্শন মতে বেদের কিছুই প্রমাণ হইল না।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

পাতঞ্জলদর্শন বা যোগশাস্ত্র।

৪র্থ অধ্যায়।

এই দর্শনকারের কোন পরিচয়ই কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। যৎকালে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচার দ্বারা মহর্ষি কপিল সমস্ত ব্রহ্মভূমি নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিতেছিলেন, তখন অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই ইহাঁর আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি যখন দেখিলেন সমস্ত মানব ক্রিয়া কাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক্য মতাবলম্বন করিতেছে এবং বেদ বিরোধী হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূলে কুঠারঘাত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই এই দর্শনশাস্ত্র রচনা করেন, এবং নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রতিযোগী দর্শন বলিয়া সেশ্বর সাংখ্য নামে এই দর্শনের নাম করণ করেন।

এই দর্শনে যোগের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বিবৃত থাকায় ইহার অপর নাম যোগশাস্ত্র। ইনি বেদের বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কেবল বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ রক্ষা করিলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা হয়, এবং বেদ যখন মান্য তখন তদুপদেশে চলা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য এই মাত্র বলিয়াছেন। পরে মহর্ষি এইরূপ ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

"ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

অর্থাৎ অবিদ্যামূলক যে ক্লেশ এবং কর্ম্মফল পরিপাকের আধার যে সংস্কারাত্মক বাসনা সমূহ, তাহা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। তাঁহার মতে ঈশ্বরে নিত্য-কালই সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহাতে সাধনের অপেক্ষা নাই।

"তস্য চ তথাবিধম ঐশ্বর্য্যম্
অনাদে সত্ত্বোৎকর্ষাৎ"

ঈশ্বর সম্বন্ধে পতঞ্জলির মনোগত অভিপ্রায় এই যে, সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ জীবাত্মাকেই বহন করিতে সক্ষম, পরমাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না। মহর্ষি পতঞ্জলি, সকলের গুরু এক জন পরম পুরুষ আছেন ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ
কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

ফলতঃ যত জন দার্শনিক পণ্ডিত দর্শনে আপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনিই কেবল সরলভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

এক্ষণে পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র যৎকিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তিনি যোগ-শব্দের অর্থ করেন যে,—

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

পরে নিশ্বাসরোধ এবং অঙ্গন্যাসের যে সকল সূত্র আছে তাহা অতি বিশদরূপে স্ফুটিত হইয়াছে। যোগ-বলে যোগী আপনাকে এমত লঘু হইতে পারেন যে, অক্লেশে নভোমণ্ডলে পর্য্যটন করিয়া জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এবং নন্দন কানন বৈকুণ্ঠধাম প্রভৃতি মানব বাঞ্ছ-নীয় স্থানও দর্শনে সক্ষম হন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি সৌরজগৎবেত্তা পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান বলে কহিয়াছেন যে, পৃথিবীর শক্তি দ্বারা আকাশস্থ গুরু দ্রব্য ধরাতলে আক-র্ষিত হয়। যথা—

"আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খ স্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা
আকৃষ্যতে যৎ পততীব ভাতি
সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে।"

কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে এই আকর্ষণশক্তি যোগ-বলের নিকটেও পরাস্ত হয়। যোগী কায়াকাশের সম্বন্ধ সংযমন পূর্ব্বক আকাশে গমন করিতে পারেন, সুতরাং নবাবিষ্কৃত ইউরোপের নূতন সভ্য শ্বেতাঙ্গগণের বিজ্ঞান-প্রধান ব্যোম-যানও ইহার নিকটে পরাভূত হয়।

যোগীর যোগবলে অতীত ও অনাগত জ্ঞানও জন্মিয়া থাকে। যথা—

"পরিণামত্রয়-সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানং।"

এবং পশু পক্ষ্যাদির অব্যক্ত শব্দ শুনিয়াও তাহার শব্দ সাধন ও অর্থ করিতে পারেন। যথা—

"শব্দার্থ-প্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাস্যাৎ
সঙ্করস্তৎ-প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূত-
রুতজ্ঞানং।"

আর বার যোগী জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্ব জন্মে কোন জাতীয়, কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাহাও বলিতে পারেন। যথা—

"সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতি জ্ঞানং।"

এখানে তিনি পর-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া তাহার মানসিক ভাব উন্নয়নে সমর্থ হন। যথা—

"প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানং।"

আমরা পাঠকবর্গের যোগবল বিদিতার্থে ও যোগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনার্থে মহাভারতীয় যোগশাস্ত্র যাহা ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণন করেন তাহারই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যোগীগণ যোগেরই বিশেষরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায়া-

ন্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন।

মনুষ্যেরা যোগপ্রভাবে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ, এই পাঁচ প্রকার দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষলাভে অধিকারী হয়। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য সমুদায় যেরূপ জাল বিদারণ করিয়া সলিল মধ্যে প্রবেশ করে এবং বলবান মৃগগণ যেরূপ বাগুরা ছিন্ন করিয়া নিরাপদ পথে সমুত্তীর্ণ হয়, সেইরূপ যোগবলান্বিত যোগীগণ লোভ জনিত বন্ধন সকল ছেদন পূর্ব্বক যোগবলে অনায়াসে অতি সুবিমল মঙ্গলকর মোক্ষমার্গে গমন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যে যোগীগণের যোগবল না জন্মে, তাঁহাদিগকে বাগুরা-নিপতিত দুর্ব্বল মৃগের ন্যায়, জালনিবদ্ধ বলবিহীন মৎস্যের ন্যায় ও পাশবদ্ধ ক্ষীণবল বিহঙ্গমের ন্যায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। যোগবলই মুক্তি লাভের অদ্বিতীয় উপায়। যোগবলবিহীন যোগীগণ বৃহত্তর কাষ্ঠসমাক্রান্ত অল্পমাত্র অনলের ন্যায় অবিলম্বে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সমুদায় যোগী যোগবলসম্পন্ন, তাঁহারা অনায়াসে বায়ুসঞ্চালিত প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ও কল্পান্ত-কালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদায় জগৎ দগ্ধ করিতে সমর্থ হন। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ যেরূপ স্রোতঃপ্রভাবে দূরে উপনীত হয়, সেইরূপ যোগবলবিহীন অজিতেন্দ্রিয় যোগীগণ বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু মহাস্রোত যেরূপ

মাতঙ্গগণকে সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বিষয় সকল যোগবলসম্পন্ন যোগীগণকে কোনরূপেই বিচলিত করিতে পারে না। যোগবলসম্পন্ন মহাত্মারা কাহারও বশবর্ত্তী না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাভূতগণের অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। ভীমপরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। তাঁহারা যোগবলে অসংখ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে সমর্থ হন। যোগবলান্বিত যোগীগণের মধ্যে কেহ কেহ যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া নিরস্ত থাকেন; আর কেহ কেহ সূর্য্য যেরূপ কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, সেইরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহাতে শিথিল প্রযত্ন হন। সংসারপাশছেদনে সমর্থ যোগবল পরিপূর্ণ যোগীগণ অনায়াসে মোক্ষলাভে সমর্থ হন, সন্দেহ নাই।

হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি তোমার নিকট যোগবলের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আত্মসমাধি ও যোগধারণা বিষয়ক সূক্ষ্ম নিদর্শন সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তিগণ যেরূপ অপ্রমত্ত ও সমাহিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করিয়া থাকে, যোগীরাও সেইরূপ অনন্যমনে যোগসাধন করিয়াই মোক্ষলাভে সমর্থ হন। লোকে যেরূপ স্নেহপূর্ণ পাত্র মস্তকে সংস্থাপন পূর্ব্বক অনন্যমনে সোপানে আরোহণ করে, সেইরূপ যোগবলসম্পন্ন ব্যক্তি সাবধান

হইয়া আত্মাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, নির্ম্মল ও নিশ্চল করিয়া ক্রমে ক্রমে যোগসম্বন্ধীয় উচ্চপদে আরোহণ করিয়া থাকেন। কর্ণধারগণ যেরূপ সতর্কচিত্তে অর্ণবপোত লইয়া সত্বরে পরপারে গমন করে, তদ্রূপ যোগবিশারদ মহাত্মারা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত ঐক্য করিয়া দুর্লভ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সারথি যেরূপ রথে লক্ষণাক্রান্ত অশ্বগণকে সংযোজিত করিয়া একাগ্রচিত্তে রথীকে অবিলম্বে অভীষ্ট দেশে লইয়া, যায়, সেইরূপ যোগীদিগের মন ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে তাঁহাদের দেহ-স্থিত আত্মাকে পরম স্থানে নীত করে। সুশিক্ষিত রথীর হস্তনির্মুক্ত শর যেরূপ লক্ষ্যে নিপতিত হয়, যোগবল-সম্পন্ন যোগীর আত্মা সেই প্রকার অচিরাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। যে মনুষ্য জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজন পূর্ব্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া যোগসাধন করিতে পারেন তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানিগণের লভ্য সনাতন মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকেন। যে যোগী অহিংসাদি ব্রতপরায়ণ হইয়া নাভি, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদ্বয়, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই সকল স্থানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে সম্যকরূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি রাশি রাশি পূর্ব্বকৃত পাপ দগ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মুক্তিলাভে সমর্থ হন।”

পূর্ব্বোক্ত বিষয় সমূহ বিবেচনা করিলে অবশ্য ইহাই

সিদ্ধান্ত যে কুম্ভক ও প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা জীবাত্মাকে শরীর হইতে কিছু বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। এই যোগবলে অষ্ট সিদ্ধ হইলে তাহার অসাধ্য কোনও ব্যাপার নাই। বর্ত্তমান সময়ে যোগপ্রণালী পুনঃস্থাপনের জন্য লোকের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে, কিন্তু কত দূর কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা ভবিষ্যদ্গর্ভে নিহিত।

বোধ হয় পূর্ব্বতন আর্য্যগণ এইরূপ যোগসাধন করিয়াই দীর্ঘজীবী ও সবল শরীর হইতেন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

ন্যায়দর্শন।

—:০:—

পঞ্চম অধ্যায়।

দার্শনিক আর্য্যগণ মধ্যে গৌতম ঋষি অতি প্রাচীন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত পাঠকেরা অনেক সময় অনেক স্থলে গৌতমের নাম শুনিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে এক গৌতমের প্রসঙ্গ আছে, তিনি মহর্ষি জাবালীর গুরু। শতক্রতুর লাম্পট্য জন্য যাঁহার গৃহিণীকে পাষণময়ী হইতে হইয়াছিল, সেই অহল্যাপতি গৌতমের নামও পাঠকের অজ্ঞাত নহে। এক গৌতম ঋষি স্মৃতিশাস্ত্রের লেখক। বৌদ্ধগণের আরাধিত এক গৌতম ছিলেন, যাঁহার নামান্তর 'গদমা'। ইহাঁদিগের মধ্যে ন্যায়সূত্র প্রণেতা কোন্ গৌতম তাঁহার নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, ন্যায়সূত্র প্রণেতা গৌতমের নামান্তর অক্ষপাদ। অক্ষপাদ শব্দের ব্যুৎপত্তি এরূপ করিলে অর্থ কিছু বিশদ হইতে পারে।—"অক্ষেণ জ্ঞান বিশেষেণ ব্যবহারেণ বা পদ্যতে জ্ঞায়ত ইতি অক্ষপাদঃ।" সুরাচার্য্য বৃহস্পতি, গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে অতি প্রগাঢ় ভাব প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন "যে ব্যক্তি তর্ক শাস্ত্রানুসারে তাৎপর্য্যার্থের অনুসন্ধান করে, সেই ব্যক্তিই শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া ধর্ম্ম নির্ণয়ে সমর্থ হয়।" বোধ হয় সুরাচার্য্য বৃহস্পতির লোকায়তদর্শন

অনুশীলন করিয়াই গৌতম স্ব মত প্রচারে দীক্ষিত হয়েন। গৌতম ঋষি এই ন্যায়-শাস্ত্রে পদার্থ ও মানস তত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণবর্গকে বিদ্যার বিবিধ শাখার উপদেশ করণার্থে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ইত্যাদি মুক্তিপ্রদ ন্যায়ানুযায়ী ষোড়শ পদার্থ সূত্র বদ্ধ করিয়াছেন। ষোড়শ পদার্থ মধ্যে আত্মিক, ভৌতিক নানা প্রকার তত্ত্ব এবং রূপ রস গন্ধাদির আলোচনা বিশেষরূপে করিবার জন্য ঐ আলোচনাকে অপবর্গের হেতু বলিয়া লিখিয়াছেন। গৌতমপ্রণীত ন্যায়দর্শনে পাঁচটী অধ্যায় আছে; প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটী আহ্নিক এবং প্রত্যেক আহ্নিকে অনেকগুলি প্রকরণ আছে। ন্যায়দর্শন-মতে জীব চৈতন্যস্বরূপ নহেন, যেহেতু সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধিকালে চৈতন্য উপলব্ধি হয় না, কিন্তু জাগ্রতকালে আত্ম-মনঃসংযোগে তাঁহার চৈতন্য গুণ জন্মে। যথা—

"অচিদ্রূপোঽথ চিদ্রূপোজীবোঽচিদ্রূপ ঈষ্যতে।
চিদাভাবাৎ সুষুপ্ত্যাদৌ জাগ্রচ্চিন্মনসা কৃতা॥"

নৈয়ায়িকেরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, সুতরাং মীমাংসকদিগের ন্যায় বেদের প্রমাণ গ্রাহ্য করিতে পারেন না। বেদবিষয়ে গৌতম এই প্রকার তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। যথা—

"তদপ্রামাণ্যম্ অনৃত-ব্যাঘাতপুনরুক্ত-
দোষেভ্যঃ।"

বেদ অনিত্য ও অপ্রমাণ, যেহেতু ইহাতে অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তি দোষত্রয় দৃষ্ট হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন, অদৃষ্টার্থক শব্দ বেদ অপ্রমাণ, কারণ ইহাতে দোষত্রয় লক্ষিত হয়। প্রথম অনৃত, যথা—পুত্রেষ্টি যাগাদিতে অনেক সময় ফলের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্ধেতু বেদবাক্যের অযথার্থ কথন। দ্বিতীয় ব্যাঘাত, যথা—উদিতকালে হোম করিবে না, এবং অনুদিতেও হোম করিবে না। তৃতীয়, পুনরুক্তি এক কথা বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে অতএব বেদ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আবার গৌতমই অন্য সূত্রে পূর্ব্বোক্ত দোষত্রয়ের নিরাকরণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ কর্ম্মকর্ত্তার অযথাবিধি কর্ম্মকরণ প্রভৃতি বৈগুণ্য প্রযুক্ত যোগফলের অনুপপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ অনুদিতকালে হোম করিব, এইরূপ স্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি তদ্বিপরীত কর্ম্ম করে, অথবা উদিতকালে হোম করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যে ব্যক্তি যথা সময়ে কর্ম্ম না করে, তাহার পক্ষে উক্ত নিষেধ, সাধারণ পক্ষে নহে, বরং গুণ-বিশেষ। কারণ অনেক বিষয় দুই তিন বার না বলিলে শ্রোতৃবর্গ তাহার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে সমর্থ হন না। যথা—

"অনুবাদোপপত্তেশ্চ ন পৌনরুক্ত্যং ।
নিষ্প্রয়োজন ত্বেহি পৌনরুক্ত্যং দোষঃ,
উক্ত স্থলে ত্বনুবাদস্য উপপত্তেঃ
প্রয়োজনস্য সম্ভবাৎ ।"

সুতরাং বেদের প্রামাণ্য কোন প্রকারেই ব্যাহত হইল না ।

এইরূপ দোষত্রয় প্রত্যাদেশ করিয়া অক্ষপাদ এইরূপে স্ব মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন । যথা—

"মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবৎ প্রামাণ্যং আপ্ত প্রামাণ্যাৎ ।"

বৃত্তিকার ব্যাখ্যা করিলেন,—

"আপ্তস্য বেদকর্ত্তুঃ প্রামাণ্যাৎ যথার্থোপ-
দেশকত্বাৎ বেদস্য তদুক্তত্বমর্থাৎ লব্ধং ।
তেন হেতুনা বেদস্য প্রামাণ্যমনুমেয়ং ।
তত্র দৃষ্টান্তমাহ—
মন্ত্রো বিষাদি নাশকঃ ।
আয়ুর্ব্বেদ ভাগশ্চ বেদস্থ এব ।
তত্র সংবাদেন প্রামাণ্যগ্রহাৎ তদ্দৃষ্টান্তেন
বেদত্বাবচ্ছেদেন প্রামাণ্যমনুমেয়া ।"

অর্থাৎ যদ্রূপ প্রণেতার উপদেশ যথার্থ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ

প্রমাণ, তদ্রূপ বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া বাৎসায়ন ভট্টাচার্য্য তাঁহার বৃত্তিতে অতি সরল ভাষায় অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—

"মন্বন্তর যুগান্তরেষু চ অতীতানুগতেষু
সম্প্রদায়াভ্যাস-প্রয়োগা-
বিচ্ছেদো বেদানাং নিত্যত্বং।
আপ্তপ্রামাণ্যাৎ চ প্রামাণ্যং।
লৌকিকেষু শব্দেষু চৈতৎ সমানং।"

অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ মন্বন্তর ও যুগান্তর সময়ে বেদের সম্প্রদায়, অভ্যাস এবং প্রয়োগ অবিচ্ছিন্ন থাকে, এজন্য বেদ নিত্য। আর যথার্থবাদী প্রণেতার যথার্থ উপদেশ, এই হেতু বেদের প্রামাণ্য লৌকিক বাক্যেও ঠিক এই নিয়ম। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে নৈয়ায়িকেরা বহুকাল প্রচলিত আছে, এজন্য বেদের নিত্যত্ব এবং বেদকর্ত্তা যথার্থবাদী বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন বেদোক্ত বিষয়ের সত্যতা আছে বলিয়া যে বেদের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে এরূপ কি আছে? ঘট কুম্ভকার কর্তৃক কৃত এই বাক্যার্থের যাথার্থ্য আছে বলিয়া যেমন ঐ বাক্যের অভ্রান্ত পুরুষোক্ততা আছে তদ্রূপ বেদ অভ্রান্তপুরুষপ্রণীত

এই মাত্র, নতুবা বেদ যে কোন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত নয় এমত নহে।

এক্ষণে ন্যায়দর্শন আলোচনা করিয়া গৌতমের অসাধারণ পাণ্ডিত্য পাঠকগণকে জ্ঞাত করিতেছি। ন্যায়সূত্রকার অনুমানকে পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নির্গমন। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষ ধর্ম্মজ্ঞানতা জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি কহা যায়, তাহারি করণ অনুমান।

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্।"

এই জ্ঞানকে অনুমিতি বলা যায়, তাহাতে ধূম আছে এবং ধূমেতে অগ্নির ব্যাপ্তি এই জ্ঞান ঐ অনুমিতির করণ, ইহাই অনুমান সুতরাং অনুমানকে লিঙ্গ-পরামর্শও কহা যাইতে পারে। যথা—

"তত্র ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষ-ধর্ম্মতাজ্ঞান-
জন্যং জ্ঞানমনুমিতিস্তৎকরণ
মনুমানং তচ্চ লিঙ্গ-পরামর্শঃ।"

গৌতম উপদেশ করিলেন যে, অনুমান পঞ্চ অবয়বি। আদ্য দুই অবয়ব, প্রতিজ্ঞা এবং হেতু সংক্ষেপে তর্কাবসায়ক হইয়া থাকে। যথা—

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

যে স্থলে প্রতিবাদী অনুপস্থিত, সে স্থলে এইরূপ সংক্ষেপে তর্ক ব্যবহার হইয়া থাকে। দর্শন ভাষ্যাদি গ্রন্থের মধ্যে এই প্রকার তর্কই সামান্যতঃ দেখা যায়। কিন্তু প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া নিরঙ্কুশ মুখে তর্ক করিলে অবশিষ্ট তিন অবয়বের প্রয়োজন হয়, কেন না এমত স্থলে প্রতিজ্ঞা ও হেতুর উপদেশ করণান্তর হেতুবাদ প্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয়। উদাহরণ—দ্বিবিধ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। অন্বীয় ও ব্যতিরেকীর লক্ষণ এই—

"সাধ্য সাধর্ম্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্ তদ্বিপর্য্যয়াদ্বা বিপরীতং ব্যতিরেক্যুদাহরণম্।"

যথা—ধূম সত্ত্বে বহ্নির সত্ত্বা যেমন মহানসে, এই অন্বয়ীর উদাহরণ। মেঘাভাবে বৃষ্টির অভাব, এই ব্যতিরেকীর উদাহরণ। চতুর্থ অবয়ব উপনয়, ইহার অর্থ সাধ্য পক্ষেতে উদাহরণাপেক্ষ উপসংহার, যথা—"পর্ব্বতে উদাহরণ বৎ ধূমের সত্ত্বা।"

পঞ্চম অবয়ব নিগমন, ইহার অর্থ হেতু স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞার পুনরুক্তি, যথা—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্।" চতুর্থ ও পঞ্চম অবয়ব ক্রমশঃ দ্বিতীয় এবং প্রথমের প্রতিপাদন পূর্ব্বক দ্বিরুক্তি, যাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

গৌতম পরমাণুবাদ লইয়া জগতের স্থিতি ভঙ্গের কারণ উপপন্ন করিয়াছেন। তিনি যদিও বেদকে প্রামাণ্য

ও কোন অদ্বিতীয় পুরুষ-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহার পুনর্জন্ম ও পরমাণুবাদে তাহা এক প্রকার নগণ্য করিয়া তুলিয়াছে। গৌতম বলেন—

'অকারণ বন্নিত্যং।'

পরমাণুর উৎপত্তি নাই, সুতরাং তাহা নিত্য এবং সৃষ্টি প্রকরণে লিখিয়াছেন—

"ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ।"

ঈশ্বর একাকী কারণ নহেন, কেন না পুরুষ-কর্ম্মাভাবে ফল-নিষ্পত্তি হয় না, ইহা কেবল পুনর্জ্জন্মবাদ বশাৎ অসামঞ্জস্য হইয়াছে। কেন না ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মকেই তাঁহার সহকারী করিলেন। কণাদ স্পষ্টতঃ অদৃষ্টবাদী, তাহা পরে তদীয় দর্শনে বিবৃত করা যাইবে। গৌতম আত্মার নিত্যত্ব স্থাপন করিবার প্রতিজ্ঞায় কহিয়াছেন যে, তাহার আদিও নাই অন্তও নাই।

অনাদিত্ব বিষয়ের হেতুবাদ এই, যথা—

"পূর্ব্বাভ্যস্ত-স্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষ-
ভয়-শোক-সম্প্রতিপত্তেঃ।"

অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাসের স্মৃতির অনুবন্ধে সদ্যোজাত শিশুর হর্ষ, ভয়, শোক হইয়া থাকে। এই সূত্রের উপর বৃত্তিকার সন্দিহান হইয়া আপত্তি শঙ্কা করিয়াছেন। যথা—

"পদ্মাদিষু প্রবোধঃ সম্মীলন-বিকার বত্তদ্বিকার।"

অর্থাৎ বালকের হর্ষ-শোকাদি জাত মুখ-বিকার পদ্মাদির বিকাসাদির ন্যায় অপর দ্রব্যাদি বিশেষাধীন হইতে পারে, পূর্ব্ব-জন্ম সংস্কার বশতঃ নহে। গৌতম এ আপত্তির এইরূপে নিরাকরণ করিয়াছেন। যথা—

"উষ্ণ শীত বর্ষাকাল নিমিত্তত্বাৎ
পঞ্চাত্মক বিকারাণাং।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব পক্ষের আপত্তি কোন কাজের নয়। যেহেতু উষ্ণ শীতাদি ঋতুত্রয়ের পঞ্চভূতের বিকার সম্ভবে।

নৈয়ায়িকেরা ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করেন, যথা—

"অন্যথা-সিদ্ধি শূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা।
কারণত্বং ভবেত্তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতং।
সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মনথাপ্যসমবায়ি
হেতুত্বং।"

অর্থাৎ অন্যথাসিদ্ধি শূন্য পদার্থের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতাই কারণ, সেই কারণ ত্রিবিধ—সমবায়ি, অসমবায়ি এবং নিমিত্ত কারণ।

উদাহরণ। যাহা সমবেত হইলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই তাহার সমবায়ি কারণ, তাহাতে আসন্ন যাহা তাহা অসমবায়ি কারণ, এবং এ উভয় হইতে পৃথক্ যাহা তাহা নিমিত্ত কারণ। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে গৌতম বলেন, উহা কর্ম্ম দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

"পূর্ব্বকৃত ফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ।"

গৌতমসূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্বের আভাস যেমন অল্প মাত্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি পরমাণুবাদও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌতম এ জগতের রচয়িতা ঈশ্বর, কি ইহা পরমাণু-সমষ্টির অভিঘাতে রাসায়নিকযোগে উৎপন্ন তাহা স্পষ্টতঃ লিখেন নাই।

"তৎকারিত্বাদহেতু।"

জগৎ ঈশ্বরের কৃত হওয়াতে পুরুষ-কর্ম্ম অহেতু হইল। এবং উদ্যোতকর মিশ্রের টীকানুসারে গৌতম ঈশ্বরকে অদৃষ্টের প্রতিযোগী করিয়া অদৃষ্টকে অহেতু করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম মোক্ষ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তদীয় ষোড়শ পদার্থজ্ঞানে মুক্তি হয়, তিনি জন্ম এবং প্রবৃত্তিকে মুক্তি-বাধক দোষের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। যথা—

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যা জ্ঞানানামু-
ত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ॥"

বাৎস্যায়ণ এই সূত্রের অর্থ করিয়াছেন—

"শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সাকার প্রাদুর্ভাবকে জন্ম কহে, জন্ম হইলে দুঃখ হয়, তাহাতে অনিষ্ট, বেদনা, বোধ, পীড়া অনুভূত হয়। এই সকল মিথ্যা জ্ঞানাদি দুঃখ পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন প্রবর্ত্তমান ধর্ম্মকে সংসার কহা যায়।"

"কিন্তু যখন তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়,

তখন মিথ্যা জ্ঞানের নাশে দোষ নষ্ট হয়, দোষের নাশে প্রবৃত্তি নষ্ট হয়। প্রবৃত্তি নাশে জন্ম নষ্ট হয়, জন্মের নাশে দুঃখ নষ্ট হয়, দুঃখের নাশে আত্যন্তিক অপবর্গ, তাহাই নিঃশ্রেয়সঃ অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ। তত্ত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যা মিথ্যা জ্ঞানের বিপরীত।" মহর্ষি গৌতম বলেন সংসার ইষ্টানিষ্ট সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মে মিশ্রিত, তন্নিমিত্ত সকলি ত্যজ্য এবং অপবর্গই পরম পুরুষার্থ। অপবর্গের অর্থ কি বোধ হয় পাঠকবর্গ জানিতে ইচ্ছা করেন। গৌতম বলেন, "দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যা জ্ঞানের অপবর্জ্জনকেই অপবর্গ কহে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুখাবস্থা।" লৌকিক ক্রিয়া কলাপ গৌতমের মতে অপবর্গের বাধক। তিনি যম নিয়মাদি যোগাভ্যাসের বিধি দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কিয়ৎ-কালের নিমিত্ত অধর্ম্ম নিবারণার্থে, অপবর্গ লাভার্থে নহে। ধর্ম্ম সাধনের ফলে যে অপবর্গের বাধা হয়, তাহা তিনি এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পক্ষ—

"ঋণ ক্লেশ প্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গা ভাবঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্মবশতঃ তিনটী ঋণগ্রস্ত হন, ব্রহ্মচর্য্যার্থে ঋষিদের, অপত্যার্থে পিতৃলোকের, যজ্ঞার্থে দেবতাদের। এই সকল ঋণ পরিশোধ করিলে পুণ্য হয়, সুতরাং তৎফল ভোগার্থে স্বর্গে গমন পূর্ব্বক পুনর্জ্জন্ম আবশ্যক। পরে অন্য এক পূর্ব্ব পক্ষ স্মরণ করেন—

"নত্বগ্নিহোত্রস্যা প্রতিবন্ধক ত্বেপিতৎ ফলঃ
স্বর্গ এবাপবর্গ প্রতিবন্ধকঃস্যাৎ।"

অগ্নিহোত্রের ফল স্বর্গ তাহাও তো অপবর্গের প্রতিবন্ধক। তদুত্তরে বলেন—

"পাত্র চয়ান্তানুপপত্তেশ্চফলাভাবঃ।"

"ব্রাহ্মণের অন্তিম আশ্রম ভিক্ষুত্ব," সে আশ্রমে যজ্ঞের শ্রুচাদি পাত্র সঞ্চয় সম্ভবে না, পাত্রাভাবে জ্ঞানীর যজ্ঞ সম্পাদনাভাব সুতরাং তৎফলাভাব, যজ্ঞের সঙ্কল্পাভাব না থাকাতে অধর্ম্মাভাব। অতএব ঐ আশ্রমে জ্ঞানীর পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলাফল প্রযুক্ত অপবর্গের প্রতিবন্ধক হয় না। ন্যায়শাস্ত্রের মুল কথা এই যে, চতুর্থাশ্রমী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারো অপবর্গ লাভের অধিকার নাই। অতএব ন্যায়দর্শন মতে বেদ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত এবং অপবর্গই সার, তদ্ভিন্ন মোক্ষ লাভের আর কোন উপায়ান্তর নাই। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে ন্যায়দর্শন যেরূপে ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন তাহা কিছুই নয়। বেদের প্রামাণ্য স্থাপনার্থে যে বচনগুলি সূত্রিত করিয়াছেন তাহাও সামান্য। সমগ্র ন্যায়দর্শনের মতে ঈশ্বর ও বেদ কিছুই নয়, বোধ হয় সমাজ রক্ষার নিমিত্ত ঐরূপ দুই একটী সূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাও পুনর্জ্জন্ম ও অচৈতন্য ঈশ্বরের সত্ত্বাঙ্গীকারে সমস্ত প্রমাণকে মাটি করিয়াছে।

বস্তুতঃ সরল মনে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, যখন তাঁহার মতে ঈশ্বরই চৈতন্যহীন, তখন অচেতন পদার্থ কি প্রকারে বেদের রচক হইতে পারে ?

আমাদের গৌতম প্রণীত ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়াই ইউরোপীয় গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল্ ন্যায়শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন। কথিত আছে মহান্ আলেক্জেণ্ডার শর্ম্মণাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্ম-ণকে স্বদেশে লইয়া যান; তিনিই গ্রীশে ন্যায়দর্শন প্রচার করিয়া, পরে অগ্নিতে আত্মশরীর সমর্পণ করেন।

মহর্ষি গৌতম এই ন্যায়দর্শনের সূত্ররূপ বীজ রোপণ করেন। পরে সেই বীজ মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশ উপাধ্যা-য়ের প্রযত্নে অঙ্কুরিত হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে শাখা প্রশা-খায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া নর্ম্মদা-তীরস্থ দিগ্‌দিগন্তব্যাপী কবীর বটবৃক্ষের ন্যায় হইয়াছিল। এই ন্যায়দর্শন মহর্ষি গৌতমের অসাধারণ চিন্তাশীলতা ও প্রগাঢ় অধ্যবসায়ের ফল। ভারতবর্ষীয় সমস্ত জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালী এই ন্যায়দর্শনে বিশেষ দক্ষ। এমন কি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড়স্থ লোকও এই বঙ্গভূমিতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ভারতে ন্যায়শাস্ত্র ছিল না, কেবল মাত্র মিথিলাতে এক খানি গ্রন্থ ছিল। তত্রত্য পণ্ডিতগণ সমীপে কোন যুবক পাঠার্থী হইলে তাহাকে গ্রন্থ দিতেন না, পাছে প্রবাসী শিষ্যবর্গ ন্যায়শাস্ত্র খানি লইয়া দেশে বহুল প্রচার করে, কিন্তু তাঁহা-দিগের চতুরতা বঙ্গ-কুল-তিলক পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির

স্মরণশক্তির নিকটে পরাভূত হইয়াছিল। শিরোমণির পাঠ সমাপ্ত হইলে তাঁহার আচার্য্য "পক্ষধর মিশ্র ন্যায়-গ্রন্থ খানি কাড়িয়া রাখেন। তখন পণ্ডিক রঘুনাথ গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিলেন, গুরো! "পত্রস্থ অক্ষর আপনার নিকটে রহিল, কিন্তু আমার হৃদ্‌প্রস্তরে ন্যায়দর্শনের যে জ্ঞান অঙ্কিত হইয়াছে তাহা বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে পারিবেন না।" এই কথা বলিয়া গুরুর নিকট হইতে স্বদেশে আসিয়া প্রথমেই ন্যায়দর্শন খানি লিপিবদ্ধ করেন। কি অদ্ভুত মেধা! কি চমৎকার স্মৃতিশক্তি! যে ন্যায়দর্শন বাদার্থ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতেও প্রগাঢ়, পণ্ডিতবর রঘুনাথ তাহা আদ্যোপান্ত অভ্যস্ত করিয়া আপনার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরে কোন সময়ে স্বীয় গুরু পক্ষধর মিশ্রকে ন্যায়শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কি সুখের বিষয় যে আমাদের বঙ্গদেশে এমন মহাপণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি এই মহাত্মা না জন্মিতেন তবে কোন দিনই বাঙ্গালীরা ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতে সমর্থ হইতেন না। আবার যদি আমাদিগের ভারতবর্ষে মহর্ষি গৌতম না জন্মিতেন ও ন্যায়দর্শন না লিখিতেন, তবে অদ্যাপি ইউরোপীয়েরা ন্যায়দর্শন কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিতেন না। যাহা হউক, ধন্য আমরা ও ধন্য দেশবাসী মহর্ষিগণ! কিন্তু আমরা এক্ষণে তাঁহা-

দিগের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম নহি, আমরা যে সিংহীর উদরে শৃগাল জন্মিয়াছি। নচেৎ যে দেশের শাস্ত্র লইয়া চির-অসভ্য জাতিরা সভ্য ও বিদ্বান বলিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইতেছেন, আমরা সেই দেশে সেই আর্য্যকুলে জন্মিয়া কেন মূর্খ ও কাপুরুষ হইলাম। জগদীশ যে ভারতের প্রতি বাম ও ভারতবাসীর প্রতি অপ্রসন্ন তাহা কার্য্যেই দেখা যাইতেছে। দেশীয় মহাত্মাগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ গ্রন্থগুলি নয়ন পথে পতিত হইলে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

ইতি ৫ম অধ্যায়।

বৈশেষিকদর্শন।

—:০:—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই দর্শন প্রণেতার নাম কণাদ বা উলূক, এজন্য এই দর্শনকে কাণাদ দর্শন অথবা ঔলূক্যদর্শন কহে; ইহাতে অন্যান্য দর্শনের অনভিমত বিশেষ নামক একটী পদার্থ স্বতন্ত্র রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এ নিমিত্ত ইহার নাম বৈশেষিক-দর্শন। কাণাদ দর্শনকে ন্যায়দর্শনের শাখান্তরও বলা যাইতে পারে। উহাতে পরমাণুবাদ স্পষ্ট উপদিষ্ট। গৌতম ঐ পরমাণুবাদ মাত্র সঙ্কেতে শিখাইয়াছিলেন। বৈশেষিক সূত্রকার তাহার বাহুল্য বিস্তার করাতে "কণ-ভুক" উপাধী প্রাপ্ত হন, বাস্তব কণাদ তাঁহার নাম নহে। আকাশ পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্য দ্রব্যে এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত তাহা হইলে কখনই পরমাণু সমূহের পরস্পর বিভিন্ন রূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। পরমাণুর অবয়ব নাই, সুতরাং এক পরমাণু অন্য পরমাণু হইতে বিভিন্ন তাহা নিশ্চয় করিবার উপায় নাই, এই বিশেষ পদার্থ নিত্য।

বৈশেষিকদর্শনের মতে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি।

বৈশেষিকদর্শন দশ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রত্যেক

অধ্যায় আবার দুই আহ্নিকে বিভক্ত। প্রথম তিন সূত্রকে অদ্ভুত উপক্রমণিকা কহিয়া থাকে। তাহাতে ধর্ম্মের লক্ষণ ও বেদের মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে। যথা—

"অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। ১।
যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ। ২।
তদ্বচনাদাম্নায়-প্রামাণ্যং। ৩॥

বৈশেষিক সূত্র—

এই দর্শনের মতে ২য় সূত্রে এই—যাহা হইতে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় তাহাই ধর্ম্ম। বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ। এক্ষণে আপত্তি এই যে বেদের প্রামাণ্য কোথায় যে, তদ্দ্বারা ধর্ম্ম সপ্রমাণ হইল। বেদ যে নির্দ্দোষ এবং নিত্য তাহা কে বলিতে পারে? বেদ যদি পুরুষপ্রণীত হয়, তাহা হইলে ভ্রম, প্রমাদ, বিরোধ এবং অপটুত্ব দোষ আসিয়া বর্ত্তে; যেহেতু উক্ত দোষ চতুষ্টয়-রহিত পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং বেদ অপ্রামাণ হইয়া পড়ে। বৈশেষিকদর্শনকার উত্তর দিতেছেন—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।"

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বেদ প্রমাণ। তৎপরে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আর একটী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন—

"বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদঃ।"

ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বাক্য-কৃতিঃ বাক্য-রচনা সা বুদ্ধি-পূর্ব্বা বক্তৃ-যথার্থজ্ঞানপূর্ব্বা। নদী-তীরে পঞ্চ ফলানি সন্তীত্যস্মদাদিবাক্য রচনাবৎ। স্বর্গকামো যজেত ইত্যাদৌ ইষ্টসাধনতায়াং কার্য্যতায়া বা অস্মদাদিবুদ্ধ্য-গোচরত্বাৎ তেন স্বতন্ত্র পুরুষ পূর্ব্বকত্বং বেদে সিধ্যতি।"

অর্থাৎ বেদবক্তার যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক বাক্য রচনা দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গ কামনা করিয়া যাগ করিবে ইত্যাদি ইষ্ট উপদেশ আমার মত ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর, সুতরাং স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অজ্ঞানাদি-দোষবিশিষ্ট মনুষ্যেরা বেদ রচনা করিতে অসমর্থ, যেহেতু বেদের বহু সংখ্যক শাখা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি ইন্দ্রেয় অগ্রাহ্য। অতএব এত শাখা-বিশিষ্ট বেদ কখনই ভ্রান্ত দুর্ব্বল মানব কর্ত্তৃক প্রণীত হইতে পারে না।

তর্কসংগ্রহ নামে আর এক খানি বৈশেষিক গ্রন্থ আছে, ইহার মতে বাক্য দুই প্রকার, লৌকিক ও বৈদিক। যাহা লোক সাধারণে ব্যবহৃত হয় তাহাকে লৌকিক এবং যাহা কেবল বেদে ব্যবহৃত হয় তাহাকে বৈদিকবাক্য কহে। বৈদিকবাক্য ঈশ্বরের উক্তি, সুতরাং যথার্থ ও প্রমাণ।

কুসুমাঞ্জলি নামে উদয়নাচার্য্যের আর এক খানি গ্রন্থ আছে। ইহার দ্বিতীয় স্তবকে লিখিত আছে যে, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেই স্বর্গে গমন করা যায়। তদ্বিষয়ের উপ-দেশ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ নিত্য ও নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণ, বেদ মহাজন গৃহীত বলিয়া প্রমাণ। এবং-বিধায় "ঈশ্বর আছেন, মানিবার প্রয়োজন নাই" এরূপ আপত্তি করিলে, তাহার উত্তর এই যে, যখন যথার্থ জ্ঞান বাহ্য করণের পরতন্ত্র, যখন সৃষ্টি ও প্রলয় ঘটিতেছে এবং যখন ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য পুরুষে বিশ্বাস হইতে পারে না, তখন ঈশ্বর প্রণীত ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে বেদের উৎপত্তি গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, সুতরাং বৈশেষিক মতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত ও মহাজন-গৃহীত বলিয়া প্রমাণ ও অবলম্বনীয়।

মহর্ষি কণাদ ঐ সূত্রত্রয় ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে আর কোথাও ধর্ম্মের ব্যাখ্যা অথবা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও তর্ক উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টবাদ পাঠ করিলে একেবারে হতবুদ্ধি হইতে হয়। কেন না তিনি ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করিয়াও সৃষ্টিকল্পে স্বয়ম্ভূ পরমাত্মার কোন কার্য্য দেখান নাই। বরঞ্চ অদৃষ্টকেই মূল বলিয়াছেন। যথা—

"অগ্নেরূর্দ্ধজ্জ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্ গমনমণু-
নাং মনস শ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতং।"

অর্থাৎ সৃষ্টি কল্পে অগ্নির ঊর্দ্ধ জ্বলন ও বায়ুর তির্যক্ গমন এবং পরমাণু ও মনের আদ্য ক্রিয়া অদৃষ্টের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

মহর্ষি কণাদ লিখিয়াছেন যে, পরমাণুর আদ্য কর্ম্ম অদৃষ্টবশতঃ হয়, আর সেই আদ্য কর্ম্মের অভিঘাতে পরমাণুর সংযোগারম্ভ হয়, সুতরাং তাহাই জগতের নিমিত্ত-কারণ, এবং শঙ্কর মিশ্রের টীকাও ঐরূপ অর্থ প্রকাশ করে। যথা—

"আদ্যমিতি স্বর্গাদ্যকালীনমিত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ তৎকালে অন্য কোন অভিঘাতের সম্ভাবনা নাই। অদৃষ্ট শব্দের অর্থ যাহা দৃষ্ট নহে। পরে ক্ত প্রত্যয়ান্ত প্রযুক্ত বিশেষণ, কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় উহা বিশেষ্যরূপে নিষ্পন্ন।

বৈশেষিকদর্শন মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ এবং পরমাণু সমবায়িকারণ।

"যথা কাণাদাস্ত্বেতেভ্য এব বাক্যেভ্য ঈশ্বরং
নিমিত্তকারণ মনু মিয়তে অণুংশ্চ
সমরায়িকারণং।"

শঙ্করাচার্য্যও অন্য স্থানে সূত্র কারের মত এইরূপে প্রতিপন্ন করেন। যথা—

"ততঃস্বর্গ কালেচ বায়বীয়ে ষণুষদৃষ্টাপেক্ষংকর্ম্মোৎ-

পদ্যতে তৎকর্ম্ম স্বাশ্রয় মণু মণ্বন্তরেণ সংযুনক্তি ততো দ্ব্যণুকাদি ক্রমেণ বায়ুরুৎ পদ্যতে এবমগ্নিঃ এব মাপঃ এবং পৃথিবী এবং শরীরং সেন্দ্রিয় মিত্যেবং সর্ব্বমিদং জগদণুভ্যঃ সম্ভবতি অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যো দ্ব্যণুকাদি গতানি রূপাদীনি সম্ভবন্তি" অর্থাৎ সৃষ্টি কালে বায়বীয় পরমাণুতে অদৃষ্টাপেক্ষ একটী ক্রিয়া হয়, তাহাতে সেই ক্রিয়াশ্রিত পরমাণু অন্য একটী অণুর সহিত সংযুক্ত হয়, পরে দ্ব্যণুকাদি ক্রমেতে বায়ু উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অগ্নি, জল, পৃথিবী, এবং ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত শরীরও পরিগ্রহ হয়। এই প্রকারে এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে।

আর ইহাতে চেতনাচেতন পদার্থনিষ্ঠ সংস্কার বা শক্তি-বিশেষকে বুঝায়, সচেতন পদার্থনিষ্ঠ হইলে শারীরিক ও মানসিক সংস্কার ও প্রবৃত্তি বিশেষকে বুঝায়। অচেতন পদার্থনিষ্ঠ হইলে ইহাতে সেই পদার্থগত শক্তি বিশেষকে বুঝায়।

যাহা হউক দেহীর পক্ষে এই অদৃষ্ট-বল পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়া বশতঃ সঙ্ঘটিত হয়, তন্নিমিত্ত ইহাকে কখন কখন ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং কর্ম্মও কহা যায়। মহর্ষি কণাদ যেমন অদৃষ্টকে সৃষ্টির কারণ কহিয়াছেন, তদ্রূপ তদীয় টীকাকার শঙ্করমিশ্রও সংসারকে ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত কহেন। যথা—

"সংসার-মূল-কারণয়ো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ পরীক্ষা।"

মহর্ষি কণাদ কহেন দেহীর দেহান্তর প্রাপ্তি অদৃষ্ট-বশতঃ হয়। যথা—

"অপসর্পণমুপসর্পণমশিত পীত সংযোগাঃ
কার্য্যান্তর সংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানিঃ।"

অদৃষ্টের অর্থ বস্তুত ইহাই। কিন্তু কণাদের অভিপ্রায় এই যে, নৈসর্গিক কারণের মধ্যে ইহা আদিম। ইহা ঈশ্বরের প্রতিযোগী নহে, অদৃষ্ট ঈশ্বরের যন্ত্র মাত্র। তিনি আপনি যন্ত্রী; বৈশেষিকদর্শন মতে পরমাণুই অদৃষ্টবল। কিন্তু তদুত্তরে ঈশ্বর-বাদী উদ্দোৎকর মিশ্র অদৃষ্টসম্বলিত পরমাণুবাদকে নিরীশ্বর-বাদ স্থির করিয়াছেন। যথা—

"যে পরমাণুং পুরুষ-কর্ম্মাধিষ্ঠিতত্বাৎ জগৎকারণত্বেন বর্ণয়ন্তি তান্ প্রতীদমুচ্যতে। পরমাণবঃ—প্রবর্ত্তত ইতি সততং প্রবৃত্ত্যা ভবিতব্যং অথ বিশেষাপেক্ষাঃ প্রবর্ত্তন্তে।"

অর্থাৎ যাঁহারা বলেন পুরুষ-কর্ম্ম অর্থাৎ অদৃষ্টের অধিষ্ঠানেতে পরমাণুর প্রবৃত্তি হয়, তাঁহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যায়, পরমাণুর চলন নিত্য কি প্রবৃত্তি দ্বারা হয়? কিম্বা তাহা বিশেষাপেক্ষ? যদি বল ক্ষীরাদি পদার্থ অচেতন হইলেও স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়, অপত্য ভরণার্থ যেমন নবপ্রসূতির স্তনে অচেতন দুগ্ধাদির স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি হয়। উত্তর এই যে, ইহা সাধ্য-সম হওয়াতে যুক্তিসঙ্গত কথা হইল না। অচেতন পরমাণু স্বতন্ত্র প্রবৃত্ত হয়,—ইহা

তোমার সাধ্য, এ স্থলে নবপ্রসূতির স্তনে দুগ্ধের স্বতন্ত্র উদ্রেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ; ভাল দুগ্ধ যদি স্বতন্ত্র উদ্রিক্ত তবে মৃতদেহেও তদ্রূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। কণাদ-দর্শন যৎকালীন ন্যায়ের শাখান্তর, তখন ঈশ্বরাস্তিত্ব কিম্বা জগদ্রচনা বিষয়ে ঈশ্বরের কোন ক্ষমতা নাই, ইহা স্পষ্টই জানা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যিনি গ্রন্থারম্ভে ১।২।৩। শ্লোক দ্বারা ধর্ম্মের মূল সূত্র গ্রথিত করিয়াছেন, তিনি তৎপরে আর কোথাও ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ করেন নাই। বরঞ্চ সৃষ্টিকল্পে অদৃষ্টসম্বলিত পরমাণুকে সর্ব্বে-সর্ব্বা করিয়াছেন। যদিও—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।"

সূত্র লিখিয়াছেন। কিন্তু শঙ্করমিশ্র আপনি আবার কহিয়াছেন যে তদ্বচনাৎ, এ শব্দে ১ম সূত্রে লিখিত ধর্ম্ম-বচনাৎ বুঝাইতে পারে। অপর পঞ্চ ভূতের সংজ্ঞা কর্ম্ম বিষয়ে কণাদ লিখিয়াছেন। যে—

"বায়ু-সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাৎ দৃষ্টং লিঙ্গং নবিদ্যতে। তস্মাদাগমিকং। সঙ্গা কর্ম্মত্বমস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গং।"

এই সূত্রের উপর টীকাকার কৌশল পূর্ব্বক ঈশ্বরবাদ অধ্যারোপ করিয়া বৃত্তিতে লিখিয়াছেন। যে,—

"অস্মদ্বিশিষ্টানাং ঈশ্বর মহর্ষীণাং সত্ত্বে লিঙ্গং।"

ও সংজ্ঞা করণ আমাদের হইতে বিশিষ্টতর ঈশ্বর মহর্ষিগণের চিহ্ন। এ ব্যাখায় এক দোষ এই যে, কণাদ এক সংজ্ঞা কর্ত্তার প্রসঙ্গ না করিয়া বহু বচনে "অস্মদ্বিশিষ্টানাং" প্রয়োগ পূর্ব্বক নানা সংজ্ঞা কর্ত্তার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ঈশ্বর-বাদের চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যায় না। বাস্তবিক "অস্মদ্বিশিষ্টানাং" বহুবচন শব্দে ঈশ্বরকে বুঝাইতে পারে না।

বৈশেষিক পরমাণুবাদে অন্য প্রকার বাধাও আছে, তাহা পঞ্চীকরণের কথাতেই প্রকাশ পায়।

"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।"

তবে কি পরমাণুর বিভাগ হইতে পারে? শঙ্করাচার্য্য পরমাণুবাদের এইরূপ দোষ দেখাইয়াছেন। যথা—

"সংযোগশ্চাণোরণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাদেকদেশেন বা সর্ব্বাত্মনা চেদুপচয়ানুপপত্তেরেণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গো দৃষ্ট বিপর্য্যয়-প্রসঙ্গশ্চ।"

অর্থাৎ দুই অণুর পরস্পর সংযোগ সর্ব্বাত্মভাবে কিম্বা একদেশ ভাবে সম্ভাব্য। যদি বল সর্ব্বাত্মভাবে সংযোগ হইয়া থাকে, তবে উপচয়ের অসম্ভব প্রযুক্ত সংযোগেও অণুমাত্রত্ব এবং দৃষ্ট বিপর্য্যয় ভাব থাকিবে। কেন না

কোন প্রদেশবিশিষ্ট দ্রব্যের অন্য প্রদেশবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত সংযোগ হইলেই তাহা দৃষ্ট পদার্থ হয়। যদি বল অণুর একদেশ ভাবে সংযোগ হয়, উত্তর—তাহা হইলে অণুর সাবয়বত্ব উপপন্ন হইল।

গৌতম এবং কণাদ কেবল আত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন; কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ বিষয়ে কিছুই কহেন নাই।

বেদবিষয়ে আস্তিক দার্শনিকদিগের মত সমালোচিত হইল। মহর্ষিগণ যেরূপ ভাবে বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর; বেদ যে শাস্ত্র ও যুক্তি মতে ঋষিদিগেরই রচিত তাহা ষড়দর্শনকর্ত্তাগণ বিলক্ষণরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। এক্ষণে নাস্তিক দার্শনিকদিগের মত উদ্ধৃত হইল।

ইতি ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

চার্ব্বাকদর্শন।

সপ্তম অধ্যায়।

—:০:—

এই দর্শনকারের নাম বৃহস্পতি। কিন্তু বৃহস্পতি নামে অনেক ঋষি ছিলেন। সুর গুরু, বৃহস্পতি নামে খ্যাত, এক বৃহস্পতি ধর্ম্মশাস্ত্রের লেখক, ইহার মধ্যে কোন্ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক চার্ব্বাকদর্শন প্রণীত হয়, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অনেকে অনুমান করেন, সুরপুরোধা বৃহস্পতিই চার্ব্বাকদর্শনের লেখক।

ইনি দেহাত্মবাদী অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত অন্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আত্মাই দেহ, সুতরাং দেহ ধ্বংশেই আত্মার ধ্বংশ হয়।

যাঁহারা দুঃখমিশ্রিত বলিয়া সুখভোগ করিতে চাহেন না, চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা তাঁহাদিগকে পশুবৎ মূর্খ বলেন। মৎস্যে শল্ক এবং কণ্টক আছে বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ করিব না? ধান্যের তুষ বাছিতে হইবে বলিয়া কি অন্নাহার পরিত্যাগ করিব? কণ্টকের ভয়ে কি কমল তুলিব না? জল কর্দ্দমাক্ত হইবার ভয়ে কি কৃষ্ট এবং বৃষ্টিসিক্ত ক্ষেত্রে শস্য বপন করিতে বিরত থাকিব? অথবা কি ভিক্ষুকের যাচ্ঞা আশঙ্কা করিয়া আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিব না?

"সুখমেব পুরুষার্থঃ। ন চাস্য দুঃখ সংভিন্ন-তয়া পুরুষার্থত্বমেব নাস্তীতি মন্তব্যম্ অবর্জ্জ-নীয়তয়া প্রাপ্তস্য দুঃখস্য পরিহারেণ সুখমাত্র-স্যৈব ভোক্তব্যত্বাৎ। তদ্যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকন্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে স যাব-দাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। যথা বা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যান্যাহরতি স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্দুঃখ ভয়ান্নানুকূল-বেদনীয়ং সুখংত্যক্তুমুচিতম্।......যদি কশ্চিদ্ ভীরুদৃষ্টং সুখংত্যজেৎ স তর্হি পশুবন্মূর্খো ভবেৎ।"

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

যখন মানবজীবনে দুঃখাপেক্ষা সুখ অনেক অধিক, এবং যখন দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের এত গৌরব, তখন দুঃখ মিশ্রিত বলিয়া সুখের প্রতি অবহেলা করা মূর্খতা, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা চার্ব্বাক মতাবলম্বীদিগের ন্যায় সুখকেই জীবনের উদ্দেশ্য, সুখকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতে পারি না। সুখ বলিতে যদি ইন্দ্রিয় সুখ অথবা আত্ম সুখ বুঝিতেন, যেরূপ তাঁহাদিগের শত্রু হিন্দু গ্রন্থকারদিগের কথায় প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই যে কেবল আমাদিগের

আপত্তি হইত এরূপ নহে। যে হিতবাদে আন্তরিক সুখের এবং অধিকাংশ মনুষ্যের সুখের প্রাধান্য, সে হিতবাদও আমরা সম্পূর্ণ দোষশূন্য ভাবি না। আমাদিগের বিবেচনা এই যে আমরা কেবল সুখভোগ করিতে জন্ম পরিগ্রহ করি নাই। সুখ যেমন আমাদিগের একটি লক্ষ্য, তেমনই আমাদিগের আরও দুইটী মহৎ লক্ষ্য আছে, সত্য এবং স্বাধীনতা। আমরা কেবল ভোগশক্তিশালী জীব নহি, আমাদিগের জ্ঞান এবং ইচ্ছাও আছে। ভোগশক্তি যেমন সুখ চায়, জ্ঞান তেমনই সত্য চায়, ইচ্ছাও তেমনি স্বাধীনতা চায়। ভক্ষ্য, পেয়, পরিধেয়ের পারিপাট্যে ভোগশক্তি সন্তুষ্ট হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি সত্য বিনা ম্লান হইবে; ইচ্ছা স্বাধীনতা সংস্থাপন ও ক্ষমতা বিস্তার ব্যতীত অসন্তুষ্ট হইবে। বুদ্ধি সত্য পাইলে, এবং ইচ্ছা স্বাধীনতা পাইলে সুখ জন্মে যথার্থ, কিন্তু যে কেবল সুখের জন্য সত্যের বা স্বাধীনতার অনুসরণ করে, আমরা বুঝি যে তাহার লক্ষ্য যে ব্যক্তি সত্যের জন্য সত্য এবং স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা চায়, তাহার লক্ষ্যের ন্যায় মহৎ নহে।

দুঃখ আছে বলিয়া সুখের প্রতি উপেক্ষা করা মূর্খতা, এই সিদ্ধান্তের পরে স্থির করা আবশ্যক যে এই সুখ বলিতে কেবল ইহকালের সুখ বুঝাইবে, না পরকালের সুখও বুঝাইবে। চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা বলেন, ইহকালের সুখ। পরকাল অসম্ভব। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চারি

ভূতের সংযোগে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, যেমন সুরা সমুৎপাদক দ্রব্যচয় সমবেত হইলে মাদকতাশক্তি জন্মে। যথা—

"অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি বার্য্যনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্য শ্চৈতন্যমুপজায়তে।
কিণ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যেভ্যো মদশক্তিবৎ॥"

সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত লোকায়ত বচনং।

সুতরাং মৃত্যুকালে যখন উক্ত চারি ভূতের বিয়োগ ঘটিবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে। দেহাতিরিক্ত আত্মা কোন স্থলেই প্রত্যক্ষ করা যায় না; যেখানে চৈতন্য লক্ষিত হয়, সেইখানেই তাহা দেহান্তর্গত। অতএব দেহের বিনাশে তাহার অবস্থিতি অসম্ভব।

আবার দেখ, যখন তুমি বলিতেছ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি পীড়িত, আমি সুস্থ, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, তখন তুমি দেহ হইতে আত্মাকে ভিন্ন জ্ঞান করিতেছ না। যথা—

"অহং স্থূলকৃশোঽস্মীতি সামান্যাধিকরণ্যতঃ।
দেহঃ স্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ॥"

সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত লোকায়ত বচনং।

সত্য বটে, আমার দেহ, এ কথাও তুমি বলিয়া থাক; কিন্তু এটি ঔপচারিক প্রয়োগ, যেমন রাহুর মস্তক। যথা—

"মমদেহোঽয়মিত্যুক্তিঃ সম্ভবেদৌপচারিকী ॥"

সর্ব্বদর্শনোদ্ধৃত লোকায়ত বচনং।

যেরূপ রাহুর মস্তক এবং রাহু অভিন্ন, কথার কৌশলে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আমার দেহ, এবং আমি সেইরূপ অভিন্ন। আমার দেহ এই ব্যবহার অবলম্বন করিয়া যদি বলিতে চাও যে আত্মাই আমি, দেহ আমার বটে, কিন্তু আমি নয়; তাহা হইলে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইবে না। আমরা যেমন "আমার দেহ" বলি, তেমনই "আমার আত্মা" ও বলিয়া থাকি। যদি "আমার দেহ" এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ দৃষ্টে আত্মাকে 'আমি' বলিতে চাও, তবে "আমার আত্মা" এইরূপ ব্যবহার দৃষ্টে দেহকে আমি বলিতে হইবে।

দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রমাণ নাই, চার্ব্বাক মতাবলম্বীদিগের এই বাক্যের প্রতিবাদ করিতে বিজ্ঞান অদ্যাপি অশক্ত। যে সকল প্রাকৃতিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত অকাট্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, সে সকল বরং লোকায়তবাদের অনুকূল। বহুব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে যে, জীবদেহের স্নায়ুমণ্ডলের তারতম্যানুসারে মানসিক শক্তির তারতম্য ঘটে। মেষের এবং মানুষের মস্তিষ্কের প্রভেদ দেখিলেই জানা যায় যে উভয়ের বুদ্ধির অত্যন্ত প্রভেদ হইবে। আবার দেখা যায় যে মস্তিষ্কের অংশবিশেষের পীড়া হইলে মানসিক শক্তিবিশেষের হ্রাস বা

লোপ হয়, এবং বৃদ্ধকালে মস্তিষ্কের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা সহকারে মনের ক্ষীণতা এবং দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চৈতন্য সমন্বিত মানসিক ব্যাপার সমুদায়, স্নায়ুমণ্ডলের উপর, বিশেষতঃ মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে, ইহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এক প্রকার স্থির করিয়াছেন। অতএব যখন দেহের কল ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং স্নায়ুমণ্ডল তদীয় উপাদান নিচয়ে পরিণত হইবে, তখন চৈতন্যও বিলুপ্ত হইবে, ইহাই অনেকের বিশ্বাস, মুখে তাঁহারা কিছু বলুন বা না বলুন। কিন্তু এ স্থলে এ কটি কথা বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বেত্তৃগণের মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপে, কেহ কেহ প্রেত তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তাঁহাদিগের দল ক্রমেই পুষ্ট হইতেছে। তাঁহারা যদি সিদ্ধকাম হন, তাহা হইলে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

একাল পর্য্যন্ত পরলোক এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন জন্য অনুমান প্রমাণই অবলম্বিত হইয়াছে। ইহলোকে শিষ্টের পুরস্কার এবং দুষ্টের দমন হয় না, ইহলোকে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, অতএব পরলোক আছে। যেমন ঘট পটাদির কর্ত্তা আছে, তেমন এই বিশাল জগতেরও এক জন কর্ত্তা থাকিবে, অতএব ঈশ্বর আছেন। এই প্রকার অনুমান অবলম্বন করিয়াই পরলোক এবং ঈশ্বরত্ব নির্ণয় করাই রীতি। চার্ব্বাক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলেন যে আদৌ অনুমান অগ্রাহ্য। অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান

সাপেক্ষ। কিন্তু এই ব্যাপ্তিজ্ঞান কিরূপে হইবে? যদি বল প্রত্যক্ষ দ্বারা। তবে কোন্ প্রকার প্রত্যক্ষ, বাহ্য না আন্তর? চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন পদার্থের সন্নিকর্ষ ঘটিলে তাহার বাহ্য প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং এরূপ প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানে সম্ভব হইলেও, ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসম্ভব।

"ন তাবৎ প্রত্যক্ষং তচ্চ বাহ্যমান্তরং বাভিমতম্। ন প্রথমঃ তস্য সম্প্রযুক্ত বিষয় জ্ঞানজনকত্বেন ভবতি প্রসর সম্ভবেহপি ভূত ভবিষ্যতোস্তদসম্ভবেন সর্ব্বোপসংহারবত্যা ব্যাপ্তের্দুর্জ্ঞানত্বাৎ।"

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

কিন্তু ব্যাপ্তি ত্রিকালব্যাপিনী। যখন আমরা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির উল্লেখ করি, তখন আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বহ্নি ধূমের নিয়ত সহচর, কেবল বর্ত্তমানের নহে, ভূত এবং ভবিষ্যৎকালেরও সহচর। যখন আমরা জন্মি নাই, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর ছিল। যখন আমাদিগের মৃত্যু হইবে, তখনও বহ্নি ধূমের সহচর থাকিবে। এইরূপ ত্রিকালব্যাপিনী ব্যাপ্তির জ্ঞান কখন বর্ত্তমানকাল সম্বদ্ধ বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা হইতে পারে না। যদি বল মানসপ্রত্যক্ষদ্বারা এরূপ জ্ঞান হইবে, তাহাও

প্রামাণ্য নহে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক অবস্থার অতি-রিক্ত বিষয়ের জ্ঞান নিমিত্ত মন বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ।

"নাপি চরমঃ অন্তঃকরণস্য বহিরিন্দ্রিয় তন্ত্রত্বেন বাহ্যেঽর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তদুক্তম চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্র বহির্মন ইতি।"

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

সুতরাং বাহ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবার যে আপত্তি, মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান হইবারও সেই আপত্তি। যদি বল অনুমান দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে। যথা—

"ন্যাপ্যনুমানং ব্যাপ্তিজ্ঞানোপায়ং তত্র তত্রাপ্যেবমিতি অনবস্থাদোষস্যপ্রসঙ্গাৎ।"

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

কারণ, যে ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা অনুমান সিদ্ধ করিতে চাও, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান সাপেক্ষ বলিতেছ। যদি শব্দকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় স্থির কর, তাহা হইলেও আপত্তি আছে। কাণাদ মতানুসারে শব্দ অনুমানের অন্তর্ভূত; যদি বল তদন্তর্ভূত নহে, ভাবিয়া দেখ শব্দের দ্বারা কিরূপে জ্ঞান হয়। লোকে যখন কোন শব্দ ব্যবহার করে, কোন্ পদার্থের উদ্দেশে ব্যবহার করিতেছে, অনুমান দ্বারা আমরা

বিবেচনা করিয়া লই। মনে কর কেহ বলিল, ঘট লইয়া আইস; যাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আদেশ হইল, সে ব্যক্তি বস্তু বিশেষ লইয়া আসিল; আমরা অমনি অনুমান করিলাম, যে এই বস্তুই ঘট। এই প্রকার বৃদ্ধব্যবহার দৃষ্টে যখন শব্দার্থের অনুমান হয়, তখন অনুমানকে ব্যাপ্তি-জ্ঞানের উপায় বলিলে যে দোষ হয়, শব্দকে অনুমানের কারণ বলিলে সেই দোষই হইতেছে। যথা—

"নাপি শব্দস্তদুপায়ঃ কাণাদ মতানুসারেণা-নুমান এবান্তর্ভাবাৎ অনন্তর্ভাবে বা বৃদ্ধব্যবহার-রূপ লিঙ্গাবগতি সাপেক্ষ তয়া প্রাগুক্ত দূষণ-লঙ্ঘনা জঙ্ঘালত্বাৎ।"

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

আবার দেখ, স্বার্থানুমানে শব্দ প্রয়োগ নাই; এ স্থলে কিরূপে শব্দ ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় হইবে?

"অনুপদিষ্টাবিনাভাবস্য পুরুষস্যার্থান্তর দর্শনে নার্থান্তরানুমিত্যভাবে স্বার্থানুমান কথায়াঃ কথা শেষত্বপ্রসঙ্গাৎ।"

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

অনুমান সিদ্ধ করিতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক, তাহা উপাধিশূন্য অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত। যখন আমরা অগ্নিকে ধূমের নিয়ত সহচর বলিতেছি, তখন

আমাদিগের জানা কর্ত্তব্য যে ধূম অগ্নি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থ সাপেক্ষ নহে। এরূপ অন্যনিরপেক্ষতার জ্ঞান যদিও প্রত্যক্ষ স্থলগুলিতে সম্ভব, তথাপি অপ্রত্যক্ষ ভূত ভবিষ্যদন্তর্গত বা দূরদেশবর্ত্তী স্থলে অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বত্র উপাধিশূন্যতা নির্ণয়াভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানও হইতে পারে না। যথা—

"উপাধ্যভাবোঽপি দুরবগমঃ, উপাধীনাং প্রত্যক্ষত্ব নিয়মাসম্ভবেন প্রত্যক্ষাণা মভাবস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি অপ্রত্যক্ষাণামভাবস্য প্রত্যক্ষ-তয়া অনুমাদ্যপেক্ষায়াঃ মুক্ত দূষণানতিবৃত্তেঃ।"

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহান্তর্গত চার্ব্বাকদর্শনং।

যাঁহারা পরিজ্ঞাত স্থলগুলিতে বস্তুদ্বয়ের সাহচর্য্যমাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগের নিয়ত সহচারিতা অনুমান করেন, পূর্ব্বোক্ত আপত্তি গুলি তাঁহাদিগের পক্ষে অকাট্য। কিন্তু যাঁহারা সাহচর্য্যাতিরিক্ত কার্য্যকারণসম্বন্ধ বা নৈসর্গিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া ব্যাপ্তি নিরূপণ করেন, তাঁহারা এ প্রকার তর্কে ভীত হইবেন না। কিরূপ সাহচর্য্য হইতে ব্যাপ্তি নির্ণীত হয় এ প্রবন্ধে তদ্বিষয়ের সমালোচনা অসম্ভব। যাঁহারা এতৎসংক্রান্ত বিস্তীর্ণ বিচার অবগত হইতে অভিলাষী, তাঁহারা নৈয়ায়িকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

যদি বেদ দ্বারা ঈশ্বর এবং পরলোক সংস্থাপন করিতে যাও, চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা বলেন যে—বেদ আদৌ অপ্রামাণ্য; কারণ উহা প্রত্যক্ষবিলোপী, যুক্তিবিরুদ্ধ ও ধূর্ত্ততাসমুদ্ভূত। যথা—

"ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদা স্ত্রীদণ্ডং ভস্ম গুণ্ঠণম্।
বুদ্ধি পৌরষ হীনানাং জীবিকা ধাতুনির্ম্মিতা॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্ব পিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তি কারকং।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্॥
স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ু স্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানা মত্র কস্মান্ন দীয়তে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবে দৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ॥
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধু স্নেহসমাকুলঃ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈ র্বিহিতস্ত্বিহ॥

মৃতানাং প্রেতকার্য্যানি নত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ।
জর্ফরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃশ্রুতম্ ॥
অশ্বস্যাত্রহি ** পত্নী গ্রাহ্য প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরশ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর সমীরিতং ॥"

"স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোক গামী আত্মা নাই; বর্ণাশ্রমাদির কোন ক্রিয়াও ফলদায়িনী হয় না। অগ্নিহোত্র, বেদত্রয় ও ভস্ম লেপন, বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদিগেরই ধাতু নির্ম্মিত জীবিকা। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন স্ব জনককে বলিদান করে না? যে জন্তুগণ মরিয়াছে, শ্রাদ্ধে যদি তাহাদিগেরও তৃপ্তি জন্মে, তবে পর্য্যটক বৃন্দের সঙ্গে পাথেয় রখিবার প্রয়োজন নাই। যদি স্বর্গস্থিত লোক ভূতলস্থ দানে তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়, তবে হর্ম্মোপরিস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্ত্যর্থে ভূতলে অন্ন কেন প্রদত্ত না হয়? যত দিন জীবিত থাক সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন কর, ভস্মীভূত শরীরের পুনরাগমন কোথায়? যদি দেহ হইতে নির্গত আত্মা পরলোকে যায়, তবে স্ব জন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেন ফিরিয়া না আইসে?. সুতরাং মৃতগণের প্রেত কার্য্য বিহিত করা ব্রাহ্মণবর্গের জীবিকামাত্র। তিন বেদের

কর্ত্তা ভণ্ড, ধূর্ত্ত, নিশাচর, জর্ফরী ইত্যাদি পণ্ডিতগণের বচনই শ্রুত। লিখিত আছে যে অশ্বমেধে—রাজপত্নী অশ্ব ধরিবেন। তদ্রূপ আমিষ ভোজন নিশাচর নির্দ্দিষ্ট।" পাঠক বুঝিলেন সুর-পুরোধা বৃহস্পতি কেমন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আপন মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

চার্ব্বাক মতাবলম্বীদিগের দ্বারা আমাদিগের বোধ হয় কয়েকটী উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ইহলোক দুঃখময় নহে, এবং সুখ পরিত্যজ্য নহে। তাঁহারা শিখাইয়াছেন যে শাস্ত্রাপেক্ষা যুক্তি প্রবল।

"কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যোহর্থ নির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্ম হানিঃ প্রজায়তে॥"

তাঁহারা অনুমানের মূল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, নৈয়ায়িকদিগকে উক্ত মূলের প্রকৃত বলাবল বুঝিতে ও তাহা দৃঢ় করিতে সমর্থ করিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শনের এক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বৃহস্পতি গায়ত্রীদেবীর মস্তকে আঘাত করেন, এবং তাহা হইতে এক একটী বষট্কার দেবের উৎপত্তি হয়। আমাদিগের বোধ হয় এই গল্পের মধ্যে একটি মহামূল্য তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। গায়ত্রীই হিন্দুধর্ম্মের বীজ মন্ত্র। বৃহস্পতি সেই গায়ত্রীর মস্তকে আঘাত করেন। সুতরাং ইহাতে বুঝাইতেছে যে, বৃহস্পতি হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ চেষ্টা

করিয়াছিলেন। অতএব তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে বৃহস্পতির উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনিই নাস্তিক মত প্রবর্ত্তক হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, লোকায়তবাদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ সংকলিত হইবার বহু পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ পুরাতন কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত। সুতরাং বলিতে হইতেছে যে, সৌত্রিক সময়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপ্রধানকালে কর্ম্মকাণ্ডের প্রথম বাড়াবাড়ির আমলে লোকায়তমতের উৎপত্তি হয়। ভট্ট মোক্ষমুলর সাহেবের মতে ব্রাহ্মণপ্রধানকাল খৃীষ্ট জন্মিবার ১৮০০ হইতে ১৬০০ বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অতএব এরূপ অনুমান নিতান্ত অন্যায় নহে যে, নাস্তিকমত প্রবর্ত্তক বৃহস্পতি খৃীষ্টাব্দের অন্ততঃ আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বহু শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে তাঁহার মত দ্বারা কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, কে বলিতে পারে? আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে রামায়ণ, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণেও তাঁহার যুক্তি সকল প্রবেশ করিয়াছে। উপনিষদ ও দর্শন সমূহে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি যে অবজ্ঞা দৃষ্ট হয়, তাহাও বৃহস্পতির তর্ক সম্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার প্রাধান্য বিলোপও যে তাঁহার হস্তে কত দূর ঘটিয়াছিল, কে নির্ণয় করিবে? বোধ হয় যেন তাঁহার নাস্তিকতাই কপিল, বুদ্ধ ও জৈমিনিকে নাস্তিক করিয়াছে; এবং তাঁহার

প্রত্যক্ষবাদ বিরুদ্ধে ধর্ম্ম রক্ষার্থ তর্ক করিতে গিয়া অনুমান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইতি ৭ম অধ্যায়।

বৌদ্ধদর্শন।

—:০:—

অষ্টম অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা শাক্য সিংহের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক রচিত দর্শনের নাম বৌদ্ধদর্শন। এই শাক্য সিংহের পূর্ব্বে যে ৫৫ জন বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা কোন দর্শন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল কি না; তাহার প্রমাণাভাব। তবে ইহা নিশ্চয় যে তাঁহারা যাহা প্রচার করিতেন তাহা বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে অতি ঘৃণা নয়নে নিরীক্ষণ করিতেন, এমন কি রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে লিখিত আছে—যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ। নাস্তিককেও তেমনি দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার

করা কর্ত্তব্য, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। যথা—

"যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ।
স্তথাগতং নাস্তিক মত্র বিদ্ধি॥
তস্মাদ্ধিয়ঃ শক্যতম প্রজানাং।
ন নাস্তিকে নাভিমুখো বধঃস্যাৎ॥"

এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না। ইহা ভিন্ন বায়ু, কল্কি—পুরাণে, গণেশ, শম্ভু প্রভৃতি—উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্য সিংহ শেষ মর্ত্য বুদ্ধ। ইঁহার পূর্ব্বে ৫৫ বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপূজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত্ত, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ "বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়" মর্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতি জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বশুভপ্রদ-ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক।

"জ্ঞান প্রভং হত তম সুপ্রভাকরং
শুভ পদং শুভ বিমলাগ্রতেজসম্।
প্রশান্ত কায়ং শুভ শান্ত মানসং
মুনিং সমাশ্রিয্যন্ত শাক্যসিংহম্।

জ্ঞানোদধিং শুদ্ধ মহানুভাবং
ধর্ম্মেশ্বরং সর্ব্ববিদং মুনীশম্ ॥"

(ললিতবিস্তর।)

আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তি স্থলে লিখিয়াছেন, "শাক্য বংশ্যত্বাৎ শাক্যঃ শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ তথাহি—শাকো বৃক্ষ বিশেষঃ তত্র-ভবা বিদ্যমানাঃ শাক্যোঃ পিতুঃ শাপেন কেচিদিক্ষ্বাকু বংশীয়া গৌতমবংশজ কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃত-বাসাশ্চ শাক্যো উচ্যতে। যথা—

"শাক বৃক্ষ প্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।
তস্মাদিক্ষ্বাকু বংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতিশ্রুতাঃ।"

শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। শাক্য সিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিল বস্তু নগরের রাজা ছিলেন।

শাক্য কপিল বস্তু নগরে বসন্তকালে শুক্ল পক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ বোধিসত্ব যে কালে তুষিত পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষিতে প্রবেশ করেন, সেই সময় তিনি নিদ্রিতা-বস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যথা—

"হিম রজত নিভশ্চ ষড়্বিষাণঃ সুচরণ চারু-ভুজঃ সুরক্তশীর্ষা উদয় মুপগতো গজো প্রধানো ললিত গতি দৃঢ় বজ্রগাত্র সন্ধি।"

অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, ছয়টি দন্তযুক্ত, মনোজ্ঞকর, সুরক্ত শীর্ষদেশ, একটী গজ মনোহর গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন, তাহা বর্ণন করা যায় না, "নচ মম সুখ জাতু এবংরূপং দৃষ্টমপিশ্রুতঃ নাপি চানুভূতম্।" ভাবিলেন একি! কখন আমার এরূপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং ধারণ করি নাই। নিদ্রা ভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্ন বিবরণ অবগত করাইলেন। রাজা গণকদিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার সকল প্রাণীর হিতকারী একটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে, এবং তৎকালে এরূপ দৈববাণী হইল। যথা—

"তুষিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্ত্বো মহাত্মা
নৃপতি তব সুত ত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ।"

অর্থাৎ হে নৃপতি তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধি-সত্ত্ব তুষিতপুর পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া, এই মায়াদেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্যসিংহ খৃষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের এক সপ্তাহের পরে তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয় এবং

তিনি তাঁহার মাতার ভগ্নী দ্বারা অতি যত্নের সহিত প্রতি-পালিত হইয়াছিলেন। পুত্র মুখ নিরীক্ষণে রাজার দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শাক্য অচিরকাল মধ্যে বহুবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীর প্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে এক-দণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বাল-সুলভ চপলতা ছিল না, এবং সময়ে সময়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহন্বক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য রাজা শুদ্ধো-দনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন, যে—

"যদি কুমারোঽভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথা গতো-ভবিষ্যতি অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ, উত নাভি-নিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি চক্রবর্ত্তীচ বিজেতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্ত রত্নসমন্বাগতঃ।"

(১২ অধ্যায়, ললিতবিস্তর।)

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং অর্হত হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন।

অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর লোপ হইবে না।

রাজা শুদ্ধোদন কন্যার অন্বেষণ করিবার আদেশমাত্র শত শত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। কুমারকে তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্যসিংহ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি, ধ্যানস্তিমীতনেত্রে ধ্যেয়. সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব; সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহাতে আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্ত্বগুণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কর্দ্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়; জল মধ্যেই শোভা পায়। অতএব যদি কোন বোধিসত্ত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে কদাচিৎ থাকিয়াও বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব লোক শিক্ষার নিমিত্ত আমাকে ভার্য্যাগ্রহণ স্বীকার করা আবশ্যক।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণি শাক্যের দুহিতা গোপানাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবতী হইলেন। সুতরাং ভগবান্ শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন।

"অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য দুহিতা শাক্য কন্যা সা দাসী শত পরিবৃতা" ইত্যাদি।

কিছুকাল দম্পতি পরম সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শাক্যসিংহ সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উদিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষুদ্বারা দেখিতেন—

"সর্ব্ব অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবা ন চ শাশ্বতাপি, ন কল্পা মায়ামরীচি সদৃশা, বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলা।"

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসার বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সংসার সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতেছিলেন; এমত সময়ে পথিমধ্যে এক জন দন্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স জন্য এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি

কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে মনুষ্য শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা এক বারও চিন্তা করি না। সারথি! রথবেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের দুরন্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃশ কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য এক দিবস শাক্যসিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সম্মুখে স্বজন পরিত্যক্ত, বন্ধুহীন, বহুরোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কর-যোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল; তাহা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, "হায়! শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তনশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যের এতাদৃশ হীনাবস্থা হইয়া থাকে। কোন্ জ্ঞানী এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করেন?" এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন না করিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ তৃতীয় বার রথা-রোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃতশরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে স্বজন বান্ধবেরা হাহাকার

করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি সারথিকে কহিলেন, "যৌবনগর্ব্ব বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু কালের মধ্যে বিনাশ হইবে। এ সকল দেখিয়া সংসারের সুখে কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে? যদি বৃদ্ধ বয়স, রোগ যন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলেই এই স্থান চিরসুখের হইত।" তাহার পর মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "সারথি! নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।"

অবশেষে চিন্তা করিতে করিতে নগরের উত্তরাভিমুখে বিলাস ভবনে গমন করিবার সময় এক শান্ত মূর্ত্তি, রোগ শোক বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে?" সারথি কহিল, "রাজকুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়া, আনন্দচিত্তে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।" রাজকুমার কহিলেন, "সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানীগণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব।

ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের ক্রমেই সংসারের বিরাগ হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিয়া, তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিলেন জীবনে ধিক্; জরাগ্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্; ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয় এমত স্বাস্থ্যে ধিক্; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় এমত জীবনকেও ধিক্—হায়!

"ধিগ্যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন।
আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধি পরাহতেন॥
ধিগ্‌জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসঙ্গে॥"

তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি মৃত্যু না থাকিত, তিনি সংসার পঞ্চ স্কন্ধ জন্য একমাত্র দুঃখ স্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে। এজন্য দুঃখ হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় করা কর্ত্তব্য। যথা—

"যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধি র্ন মৃত্যু
স্তথাপিচ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিংপুন র্জরা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধা
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং॥"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজলনেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া, সুখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য নানা অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন; যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন। যথা—

"ইচ্ছামি দেব জরমহ্যনমাক্রমেয়া।
শুভ্রবর্ণ যৌবন স্থিতোভবি নিত্য কালং॥
আরোগ্য প্রাপ্তু ভবিনোচ ভবেতব্যাধি।
রমিত আয়ুশ্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যুঃ॥"

রাজা এ সকল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কহিলেন, "হে পুত্র! যে চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।" রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা

করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ আননে পুত্রকে অভীষ্ট-সিদ্ধি জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

একদা গভীর রজনীযোগে শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার স্ত্রী এবং এক মাত্র শিশুপুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাত কালে ঘোটক পরিত্যাগ করত অনোমা নদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৈশালীতে আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে অগত্যা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্য্যশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এ স্থান হইতে পঞ্চজন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উর্ব্বিলব নামক গ্রামে ৬ বর্ষকাল কঠিন পরিশ্রমের সহিত সমাধি, মহাপ্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না। ক্রমেই তাঁহার সহাধ্যায়িগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বুদ্ধি-ক্রম মূলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, এবং তিনি জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধজ্ঞান লাভ করিলেন।

৫৮৮ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া বারাণসীতে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বসরের প্রযত্নে রাজগৃহে বক্তৃতা কালে বহুব্যক্তি বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার উদ্দেশে এক ধনাঢ্য বণিক কর্ত্তৃক কালান্তক বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল; তথায় তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিত-গণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদ-বিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শাক্যসিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র, মৌদ্গাল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভি-ব্যাহারে কিছুকাল মগধেশ্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে উক্ত নৃপতি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে তিনি শ্রাবস্তীতে বাস করেন। তথায় অনাথ পিণ্ডদ নামক বণিক তাঁহার জন্য একটী সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধি-

পতি এবং প্রসন্নজিৎ নৃপতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশ বর্ষ পরে তিনি কপিলবস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্য বংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে ৫৪৩ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব বৎসরে কুশীনগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিসত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিন বার স্বশিষ্যবর্গকে ধর্ম্মের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর করিল না। সে সময় কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যু কালে ভগবান্ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষ বার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি; সংসারে সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল; কিন্তু অর্হতগণ পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকাবেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দন কাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নব বস্ত্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহাকাশ্যপ তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। নশ্বর

শরীর ধ্বংশ হইয়া ভস্মাবশিষ্ট রহিল। ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীতাদি করিতে করিতে নগরমধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্ত-দিবস রক্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উত্থদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর এই ৮ স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর অষ্টস্তূপ নির্ম্মিত হইল। বুদ্ধদেবের উপর এতদূর ভক্তি এবং অনুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং একাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্য-দেবের ন্যায় তাঁহার মত শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক মৃত্যু অন্তে জগ-তের হিতের জন্য প্রচারিত হয়। তাঁহার প্রসিদ্ধ শিষ্য ত্রিতয় "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধর্ম্ম কাশ্যপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালী দ্বারা, খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্য্যগণ ধর্ম্মের গুহ্য কথা সকল মীমাংসা করিয়া

বিবিধ গ্রন্থ প্রচার করেন। আষাঢ় মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত সুপণ্ডিত, স্থবির ও ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ মায়াময় মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে আনন্দকে কহিয়াছিলেন যে, আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে। এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এতদ্‌বাক্যে সকলই সম্মত হইলেন এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণিশিখর মূলে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হয়। এ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নব ধর্ম্মাবলম্বী। বৈদিক কার্য্যকলাপের ক্রমেই হতাদর হইতে লাগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞার্থে পশুবধের শোণিতস্রোতও ক্রমেই রুদ্ধ হইল।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন এবং শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক

বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "তদ্বিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।" সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গভীর অর্থবান্ এবং সুপরিপাটী।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

তথাহি কৃত্যাদেবী বাক্যং—
"লোকে ভগবতো লোক-
নাথাদারভ্য কেবলম্।
যে জন্তবো গত ক্লেশান্ বোধিসত্ত্বান-
চেহিতান্।
সাগসেপি নকুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে।
বোধিং স্বস্যৈব নেয্যন্তি তে বিশ্বধারণো-
দ্যমাঃ।"

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া, যে সকল জীব গত ক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গত ক্লেশ করিতে বাঞ্ছা করেন তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা—

"বোধিসত্ত্বস্য পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু—"

এবং বুদ্ধদেবকে তাহারা "জরা মরণবিঘাতী ভিষগ্বর ইবোদ্গতঃ" জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্য জন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বৌদ্ধমাত্রেরই পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীব মাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে।

মুসার ন্যায় শাক্যসিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যথা—জীব-হিংসা করিও না, চুরী করিও না, পরদার করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে এই ৫ টি আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা—দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন অনুচিত এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে। বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক খৃষ্ট শিষ্যগণ কহেন, যীশু প্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায় স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা

অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ এক বার "ধর্ম্ম পদ" গ্রন্থপাঠে বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষ দর্শনবাদি গণকে এক এক বার পাঠ জন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন। যথা—

"কৃত্তিঃ কমণ্ডলু মৌণ্ডং চীরং পূর্ব্বাহ্ণ ভোজনম্ +
সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুভিঃ।"

অর্থাৎ চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর এই কয়েকটী বৌদ্ধদিগের যতি ধর্ম্মের অঙ্গ। ইহারা মালা জপিবার সময় ইহাই মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে। যথা—

"অনিত্য দুঃখম্ অনাত্য।"

ইহাকে ত্রি লক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মূর্ত্তির সমীপে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব্ব কালে বৌদ্ধগণ

ধর্ম্ম সঙ্গম মধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্য মাসে দুই বার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে। যথা—খুদক পাঠ।

"নম তস ভাগবত অর্হত সম সম বুদ্ধসঃ
বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দুতিম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি
দুতিম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি
দুতিম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
দুতিম্পি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি বুদ্ধম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি ধর্ম্মম্ শরণম্ গচ্ছামি।
তীত্তম্পি সঙ্গম্ শরণম্ গচ্ছামি।
শরণ্যতম্।"

"বোধিচিত্ত বিবরণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বৌদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে "সৌত্রান্তিকো

বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ।* সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্ম্মের আচার্য্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি ও স্থানে নামমাত্র বোধক কি তাহার শাস্ত্রপ্রস্থান বোধক স্থির করা যায় না।

---

* সৌত্রান্তিক। ইহাঁদিগের মতে জ্ঞানদ্বারা যে ক্ষণিক বাহ্য পদার্থের অনুমান করা যায়, তাহাই পরম পুরুষার্থ। অর্থাৎ বাহ্যার্থ জ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর নাই।

বৈভাষিক। ইহাঁরা বলেন, যে ক্ষণিক-বাহ্যার্থই পরম সুখ কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ নহে।

যোগাচার। ইহাঁরা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, ক্ষণিক সুখই ইহাঁদিগের মতে পরম পুরুষার্থ। ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই ইহাঁরা বিশ্বসৃষ্টির মূল বলেন। ক্ষণিক বিজ্ঞান দুই প্রকার; যথা—প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান, ও আলয়-বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান কেবল আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

মাধ্যমিক। ইহাঁরা শূন্যবাদী অর্থাৎ ইহাঁদিগের মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। শূন্য হইতে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং শূন্যেতেই বিলয় হইবে। যে সমস্ত বস্তু স্বপ্নাবস্থাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, জাগ্রদাবস্থাতে তাহার কিছুই দেখা যায় না, এবং জাগ্রদবস্থাতে যে সকল বস্তু দেখা যায়, স্বপ্নাবস্থাতে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। আর সুষুপ্তি অবস্থাতে কিছুমাত্র দেখা যায় না। অতএব কোন বস্তুই যে সত্য নহে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

কুশীনগরের সন্নিকটস্থ কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যু যন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর—দৃশ্যটী দেখিলে বোধ হয় যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও।" ভগবান্ বারত্রয় এই কথা বলিলেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না; ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি যে, পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় জীবনক্ষেপ কর।" ভগবানের মৃত্যুর পর অর্হতগণ কহিলেন, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন মগলাধিপতি মহারাজ মিনিন্দকে কহিলেন, "বহুগুণসম্পন্ন ভগবান্ জীবিত আছেন।" তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তবে তিনি কোথায়?" আচার্য্য নাগসেন কহিলেন, "ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে

না। তিনি এখানে সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্ত্তমান নাই। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? সেইরূপ আমাদিগের ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অস্তগত হইয়াছেন, আর উদিত হইবেন না। তিনি আর কোন স্থলেই বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম্মমধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন।" অমারা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্ম্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান শ্রাবস্তী, তথা হইতে তিনি সকল লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্য উহার অপর নাম ধর্ম্মপত্তন।

ধ্যাননিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট! এই জীবলোকে কেবল কষ্টময়। জন্মাইতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—চ্যুত হইতেছে ইত্যাদি লোক সকল এই মহাদুঃখ স্কন্দের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। এই গভীর চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন "কি হেতু জরামরণ হয়?

"জরামরণং কিং মূলকং?"

এই প্রশ্নোদয়ের পর ক্ষণেই উদয় হইল—

"জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং।"

জাতি সত্ত্বাই জরামরণের কারণ।

"কিং মূলকং জাতিঃ?"

জাতির মূল কি?

"জাতির্ভবতি ভব প্রত্যয়া।"

ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎপত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পৃথিবী ধাত্বাদি) উপাদানের মূল তৃষ্ণা—তৃষ্ণার মূল বেদনা—বেদনার মূল স্পর্শ—স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন—ষড়ায়তনের বীজ নামরূপ—নামরূপের বীজ বিজ্ঞান—বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার—সংস্কারের বীজ অবিদ্যা। দুঃখস্কন্দের এই হেতুভাব অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতুভাবের উচ্ছেদ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপ ক্রমে সমস্ত দুঃখস্কন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অতএব দুঃখনিরোধের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ হইলে সুখদুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একেবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্যসিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি,

"জরা মরণ বিঘাতি ভিষগ্বর"

বলিয়া খ্যাত হইলেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এ জগতে নাই। এই বিজ্ঞান নিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া থাকেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ-সূত্র, এবং উপালী নামক শূদ্র বিনয়নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই "রত্নত্রয়ে" শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসার মধ্যে সজীব রহিয়াছেন; এই গ্রন্থত্রিতয়ের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ কহেন "এ সকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্ত্তনীয় কেন না বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নাই।" এই "রত্নত্রয়" সূত্র, নিয়ম, অভিধর্ম্ম, ত্রিবিধ গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে, পালিভাষায় উহার নাম "তিপিটকম্।" তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ

অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে ত্রিপিটক পালি-ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন "বুদ্ধবাক্য সকল সকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত।" মহাবংশের লিখনানুসারে সুভূতিনামক সিংহল দেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন ত্রিপিটক শ্রুতির ন্যায় পূর্ব্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল, তৎপরে অনুমান খৃষ্ট জন্মের ১০০ একশত বৎসরের পূর্ব্বে ভট্টগমনীর রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বে মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থ সিংহল দ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদ সুপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারিশত খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালিভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। বিনয়পিটকে শাক্যসিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ব্বসৎকর্ম্ম-পদ্ধতি লিখিত আছে। সূত্রপিটকে বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যান পরিপূর্ণ এবং অভিধর্ম্মপিটকে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

নির্ব্বাণ কামনাই বৌদ্ধজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্যই তাহারা শারীরিক নানাবিধ কষ্ট

স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বৌদ্ধগণকে একমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই কষ্টদায়ক। সৎকার্য্য দ্বারা পুনর্জ্জন্ম না হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহাই বৌদ্ধগণের পরম সুখ। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে—

যেমন ক্ষুধা রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেই মত জীবন দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, কিন্তু একমাত্র নির্ব্বাণই পরম-সুখ। নির্ব্বাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত অর্হতগণকে এই সকল গুণ-বিশিষ্ট হইতে হইবেক। যথা—দানশীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি, জ্ঞান, ইহাকে পারমিতা কহে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ নাই। বৌদ্ধগ্রন্থমধ্যে আদিবুদ্ধ শব্দের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান করেন কিন্তু সেটী ভ্রম, উহার অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দীপঙ্করাদি-বুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। পরমযোগী ঈশা যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ শাক্যসিংহের মুখ হইতে শত শত বৎসর পূর্ব্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। এক সময়—

"ওঁ মণি পদ্মেহুঁ।"

এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীক্‌গণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ইতি ৮ম অধ্যায়।

জৈনদর্শন।

—:০:—

নবম অধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে মহাবীর কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হয়, ইনি চতুর্ব্বিংশতি বা অন্তিম জিন। ইনি ভারতবর্ষের রাবণনগরের অধীশ্বর কাশ্যপ বংশোদ্ভব সিদ্ধার্থ নৃপতির সহধর্ম্মিণী ত্রিশলার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। পুত্র প্রসবে রাজ্ঞী ত্রিশলার আনন্দের সীমা ছিল না। তখন স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্যে

স্থাবর জঙ্গম আনন্দে পুলকিত হইল। নৃপতি পুত্রের নাম বর্দ্ধমান রাখিলেন এবং মহাবীর অখ্যা প্রদান করিলেন।

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর নৃপতির কন্যা যশোদার পাণিগ্রহণ করেন। এই উদ্বাহের অল্পকাল পরেই তাঁহার প্রিয়দর্শনা নাম্নী একটী কন্যা জন্মিল। এই কন্যাকে কুমার জামলি পাণিগ্রহণ করেন। ইতি মধ্যে মহাবীরের পিতা মাতার মৃত্যু হইল; ইহাতে তিনি সংসার অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর স্থির করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দি-বর্দ্ধনকে রাজ্যভার প্রদান করতঃ যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এবং ক্রমাগত দুই বৎসর ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার বহুদর্শনে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং ৬ বৎসর কাল যোগাভ্যাসে নিযুক্ত রহিলেন। সিদ্ধার্থ-নামক যক্ষ গোপনে তাঁহার সহায় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহের নলন্দ নামক গ্রামে মহা-বীরের গোশল নামক নীচ কুলোদ্ভব এক শিষ্য হইল। এ ব্যক্তির আচার ব্যবহারে পল্লীর অনেক লোকের সহিত বিবাদ ঘটিত। একদা পার্শ্বনাথের নিজের মতাবলম্বী বর্দ্ধন স্থরির শিষ্যগণের সহিত বসন পরিধান সম্বন্ধে বিবাদ ঘটিল। গোশল মহাবীরের মতাবলম্বী দিগম্বর, তিনি পার্শনাথের মতাবলম্বী শ্বেতাম্বর জৈনগণকে তাড়না করাতে, তাহারা কহিল—

"নিগ্রন্থাঃ পার্শ্ব শিষ্যাঃ বয়ং।"

তাহাতে গোশল প্রত্যুত্তর করিল—

"কথন্তু যূয়ং নিগ্রন্থা বস্ত্রাদি গ্রন্থ ধারিণঃ।
কেবলং জীবিকা হেতোরিয়ং পাষণ্ডকল্পনা।
বস্ত্রাদিসঙ্গরহিতো নিরপেক্ষা বপুষ্যপি।
ধর্ম্মাচার্য্যো হি যাদৃঙ্‌মে নিগ্রন্থা স্তাদৃশাঃ
খলু।"

আমরা ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য, আমরা নিগ্রন্থ অর্থাৎ কোন বন্ধন আমাদের নাই। তদুত্তরে গোশল কহিল "তোমাদের কোনও বন্ধন নাই এ কেমন কথা? বিলক্ষণ বস্ত্রগ্রন্থি দেখিতেছি। হায়! হায়! কোন পাষণ্ড ব্যক্তি এই কল্পনা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য যেমন বাহ্য শরীরে বস্ত্রাদিসঙ্গ রহিত তেমনি অন্তরেও সঙ্গ রহিত। আমাদের অন্তর্বহিঃ কোথাও বন্ধন অপেক্ষা করে না।

পরে মহাবীর সশিষ্য মগধে ও অযোধ্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বজ্র ভূমি, সুহ্ম ভূমি এবং লাট বা লাড় দেশীয় গোন্দগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধচিত্ত হয়েন নাই। এ সময় তাঁহার শিষ্য তেজঃলেশ্য যোগ শিক্ষা

করিয়া স্বয়ং "জিনত্ব" প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি কৌশাম্বী নগরে গমন করিলে নৃপতি শতানীক তাঁহার বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসে ঋজুপালিকা নদী তীরস্থ শালবৃক্ষমূলে জপ করিতে করিতে তাঁহার যে জ্ঞানলাভ হইল, সেই জ্ঞানই জৈনধর্ম্মের চরম সীমা। এক্ষণে মহাবীর জিনপদ বাচ্য হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিষ্য তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইল। তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের মোক্ষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা করত মগধের অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিলেন। মহাবীরের জ্ঞানের ইয়ত্তা রহিল না, তিনি মুক্তিপ্রদ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সুখ, দুঃখ, স্বাধীনতা, সাংসারিক জ্ঞান হইতে—

"সর্ব্ব সন্তাপাভাবাৎ"।

সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

মহাবীরের চতুর্দ্দশ জন শিষ্য সর্ব্ব প্রধান। তাঁহারা যদিও জিন নহেন, তথাপি জিনতুল্য মহাপণ্ডিত।

মহাবীর বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে সময় তাঁহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র সাধু, ৩৬০০০ সহস্র সাধ্বী, চতুর্দ্দশ পূর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, ৩০০ শত

শ্রমণ, ১৩০০ শত অবধি জ্ঞানী, ৭০০ শত কেবলী, ৫০০ শত মনোবিৎ, ৪০০ শত বাদী, একলক্ষ উনষষ্টি সহস্র শ্রাবক, এবং এই সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা, এবং গোতম ও সুধর্ম্মা নামক দুই জন গণধর সঙ্গে ছিল। মহাবীর এই সকল প্রগাঢ় চিন্তাশীল শিষ্যগণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্শ্বনাথের ২৫০শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয়।

মহাবীর চতুর্ব্বিংশতি জিন। তাঁহার পূর্ব্বে ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপর্শ, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতলা, শ্রেয়ংশ, বাসুথুজ্য, বিমলা, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্ত, আরামালি, সুব্রত, নাম, নেমি ও পার্শ্বনামক তীর্থঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত।

প্রথম বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইবার কারণ এই যে বৌদ্ধেরা আত্মার স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহ্য বস্তুর পৃথক্ বস্তুত্ব স্বীকার করেন না। আদি জৈনাচার্য্যদিগের উহা রুচিকর না হওয়াতেই তাঁহারা ভিন্ন হইলেন। ভিন্ন হইয়া আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্য নানা যুক্তি উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

জৈন দুই প্রকার। শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্ম্ম প্রভেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত সূরি এইরূপ বলিয়াছেন। যথা—

এই মতের উপাস্য দেবতা জিন। বল, ভোগ, উপ-ভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, আরতি, রাগ, দ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ মনুষ্য সংক্রান্ত দোষ যাঁহার নাই তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা এবং জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিতি। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয় ইহাদের সম্মত। তর্ক রীতির নাম স্যাদ্বাদ। ইহাদিগের মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক মতে ৯টা, এক মতে ৭টী। তন্মধ্যে নিত্যানিত্য সম্মিশ্র। ঐ সকল তত্ত্বের নাম জীব (১) অজীব(২) পুণ্য[৩] পাপ[৪] আশ্রব[৫] সম্বর[৬] বন্ধ[৭] নির্জরণ[৮] মুক্তি[৯]। চেতন বস্তু জীব—অচেতন পদার্থ অজীব—সৎকর্ম্ম সমূহ পুণ্য—তদ্বিপরীত পাপ—কর্ম্মের বন্ধন জনকতা আশ্রব—কর্ম্মত্যাগ নির্জর—অষ্ট কর্ম্মক্ষয় মুক্তি। সপ্ত তত্ত্ববাদীর মতে মোক্ষ পদার্থটী নির্জারণের অন্তর্ভূত—পুণ্য সংশ্রবের পাপ আশ্রবের অন্তর্গত। এই মতের সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ-রহিত, কেশ-সংস্কার করে না ও ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ। শ্বেতাম্বরেরা উহা করে না। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, দিগম্বরেরা রত।

নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্য্য-লিঙ্গক—ঈশ্বরানুমান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ—

"ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ।"

ক্ষিত্যাদি পদার্থের কোন না কোন কর্ত্তা আছে, যেহেতু ক্ষিত্যাদি বস্তু জন্য। যে বস্তু জন্য হয়, সেই বস্তুর কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। এইরূপ ঈশ্বরানুমান জৈনেরা করে না। তাহাদের মতে জগৎ জন্যই নহে। তাহারা এই মাত্র বলে যে, কোন সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর। যথা—

"সর্ব্বজ্ঞো জিত রাগাদি দোষ স্ত্রৈলোক্য
পূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থ বাদীচ দেবোহর্হন্ পরমেশ্বরঃ।"
ইতি অহং চন্দ্র সূরী।

উহাদের ঈশ্বরানুমান প্রণালী এই যে, কোন এক আত্মা সর্ব্ব পদার্থে সাক্ষাৎকারী আছে; কারণ যখন দেখা যায় যে আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, কোন আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অল্প, কোন আত্মার অধিক। এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক একেবারে নাই হইতেও পারে। যাহার কোন প্রতিবন্ধক একেবারে নাই, সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর।

জৈন মতে জীব দুই প্রকার, সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব দুই প্রকার, সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষা ক্রিয়াকলা-

পাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক আর তদ্রহিত জীব অমনস্ক। এই অমনস্ক জীব দুই প্রকারে বিভক্ত, ত্রস ও স্থাবর। শঙ্খ গণ্ডলোক প্রভৃতি দ্বি ইন্দ্রিয় ত্রি ইন্দ্রিয় ভেদে ত্রস চারি প্রকার। পৃথিবী জল বৃক্ষাদি ভেদে বহুবিধ স্থাবর তত্ত্বজ্ঞান জিনোক্ত উক্ত পদার্থের স্বরূপাবগতি। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় গুরূপদেশ ও শাস্ত্র চর্চ্চা জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান। মুক্তি—জ্ঞানাবরণ ও কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে সুখ স্বরূপে অবস্থান। কাহারও মতে সতত ঊর্দ্ধ গমন। যথা—

"গত্বাগত্য বিবর্ত্তন্তে চন্দ্র সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বালোকাকাশ মাগতঃ।"

ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙ্গি অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত।

কল্প সূত্রের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের বিবিধ নিয়ম লিখিত আছে, সাধাণতঃ তাহাদের পূজা পদ্ধতির মন্ত্র এই। যথা—

"ওঁম্ শ্রীং—ঋষভেয় স্বস্তি—ওঁম্
ম্হ্রীংহয়্—ওঁম্ হ্রীং শ্রীসুধর্ম্মাচার্য্য
আদি গুরুভ্যোনমঃ ওঁম্ হ্রীং হ্রীম্
সমজিন চৈত্যলেভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যোনমঃ।"

ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা—

"নমো অরীহন্তানং নমো সিদ্ধানং
নমো আয়রীয়াণং নমো উজ্জহ্বয়াণং
নমো লোই সর্ব্বসাহুণং।"

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহে, তাহারা ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম এইমাত্র জানে যে—
"ধর্ম্মো জগতঃ সারঃ। সর্ব্বসুখানাং প্রধান হেতুত্বাৎ।
তস্যোৎপত্তির্মনুজাঃ সারং তেনৈব মানুষ্যো।"

অর্থাৎ ধর্ম্মই জগতের সার যেহেতু ধর্ম্ম সুখ মাত্রেরই প্রধান কারণ। এবম্ভূত ধর্ম্মের উৎপত্তিকারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্যকে জীব মধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন "স্বর্গাপবর্গপ্রদঃ" স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্ম্মের ফল, ও "সাধূনাং আচারঃ" সাধু সম্মত আচার অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচরণ করেন তাহাই ধর্ম্মকে জানিবার পথ। এবং ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে—

"পুরুষ প্রধানত্বাৎ ধর্ম্মস্য।"

অর্থাৎ যদ্দ্বারা মনুষ্যেরা ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারে। যতিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (অষ্টম তপস্যা) যথা—

"চৈত্যে পরিপাঠো সমস্ত সাধুবন্দনং

সাম্বৎসরিক প্রতিক্রমণং মিথঃ
সাধর্ম্মিকং শমনং অষ্টমং তপশ্চ।"

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) স্থানে পরিপাঠ (১) সাধু-দিগের বন্দনা করা [২] বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ এক বার তীর্থ পরিভ্রমণ [৩] পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান [৪] ইন্দ্রিয় দমন [৫] এই পাঁচটী অষ্টম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অশোকের ন্যায় তাহাদিগেরও এইরূপ রাজ ঘোষণা আছে—

"অমারী—ঘোষনাদ।"

অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মৃত্যু মুখে পাতিত করিওনা। জৈন-ধর্ম্মের এই মাত্র সার নীতি। যথা—

"ত্যজ হিংসাং কুরু দয়াং ভজ ধর্ম্মং সনাতনম্।
স্বদেহেনাপি সত্বানাং বিধেহ্যুপকৃতিং তথা।
তদ্বৈরিণ্যপি মাবৈরং কুর্য্যাঃ স্বস্য হিতায়চ।
উবাচ চ জিনো দেবো গুরুর্মুক্ত পরিগ্রহঃ।
দয়া প্রধানো ধর্ম্মশ্চ ত্রয়মেতৎ সদাস্তমে॥"

শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যম্।

উদয়নাচার্য্য বলেন—

"যস্ত্বসাধারণো মুখ মণ্ডলী করণাদিঃ
কেশোল্লুঞ্চনাদির্নাসৌ সর্ব্বৈরনুষ্ঠীয়তে।"

অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকা গ্রহণ, কেশোল্লুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটী জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম্ম; তাহা অন্য কোন জাতির নাই।

অমরসিংহ এবং হেমচন্দ্র এই দুই জন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কোষকার জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির অমরসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি জৈন গ্রন্থের মতানুসারে মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহাবীরের পরে সুধর্ম্ম, সতীশ্বর, বজ্রসেন, চন্দ্র, মনাতুঙ্গ, জয়দেব, শ্রীমন্, বিজয় সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলী জৈনধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্ক তরঙ্গে জৈনদিগেকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধিই জৈনধর্ম্ম হীনপ্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে। জৈনদিগের আবু, গির্ণার, শত্রুঞ্জয় এবং পার্শ্বনাথ পর্ব্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম্য

বর্ণিত আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে জৈনাচার্য্য ধনেশ্বর স্থরি সুরাষ্ট্র দেশের শত্রুঞ্জয় নামক গিরির স্তোত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং সিদ্ধ পুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুর্দ্দশ সর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থ সুরাষ্ট্রাধিপতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বর স্থরি ৪৭৭ শকে রচনা করেন। তিনি বলভীরাজ শিলাদিত্যের পার্ষদ এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন।

ইতি নবম অধ্যায়।

ত্রিবেদ কি চতুর্ব্বেদ ?

দশম অধ্যায়।

ভারতীয় আর্য্য জাতির সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ। এই বেদ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ;—মন্ত্র প্রধান ও ব্রাহ্মণ প্রধান। বেদ কত কাল পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের হৃদয়-সিংহাসনে প্রভুত্ব করিয়াছিল, তাহার প্রমাণাভাব। তবে ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, সৃষ্টির পর হইতে সরল জীবনে যত

লোক অবনত মস্তকে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়াছিলেন, তত কাল অক্ষুণ্ণভাবে আর্য্যাবর্ত্তে বেদ বিপ্লাবিত ছিল। যখন বেদের প্রতি সন্দিহান হইয়া কতিপয় মহর্ষি দর্শন-শাস্ত্রের সূত্রপাত করেন, তখন হইতে ভারতে পুরাণের সৃষ্টি হয়। পুরাণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষিগণ যখন দেখিলেন, ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের ক্ষমতা হ্রাস হইতেছে, ব্রাহ্মণগণ আর ত্রিবেদ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন এবং তদনু-যায়ী ঈশ্বরোপাসনা করিতেও অক্ষম, তখন সমুদায় বেদ মন্থন করিয়া বেদের ক্রমানুসারে উহা ঋগ্বেদ, সামবেদ, এবং যজুর্ব্বেদ নামে প্রচার আরম্ভ করিলেন। কাল ক্রমে যখন ব্রাহ্মণগণ এরূপ বীর্য্যহীন হইলেন যে, বেদরূপ মহা-শৈল বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহারত্ন স্বরূপ ধর্ম্মানুপ্রাণীত জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছেন না, তখন বেদের অর্থ সকল সংগ্রহ করতঃ প্রাচীন ইতিহাস সংযো-জন পূর্ব্বক সুকোমল সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। যে পুরাণ গৌরবে মুগ্ধ হইয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় অহোরাত্র পুরাণ আলোচনা করত এক জন জর্ম্মান পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "ভারতীয় দিগের কর্ম্ম কাণ্ড ও পুরাণরূপ মহারত্নের আকর হইতে গভীরতম তত্ত্ব সকল উদ্ধৃত হইতে পারে।" যাহা হউক এক্ষণে প্রস্তাব্য বিষয়ের আলোচন করা যাউক।

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে অনেকেই চারি বেদ

স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ব্রহ্ম এক সময়েই সাম ঋক যজু ও অথর্ব্ব বেদকে নিশ্বাসের ন্যায় অবলীলা-ক্রমে প্রচার করেন, তজ্জন্যই বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া থাকে। ফলতঃ সাম, ঋক, যজু, এই তিনটীই আদি, অথর্ব্ব-বেদ উক্ত বেদত্রয়ের সারসংগ্রহস্বরূপ, উহা অথর্ব্বনামক জনৈক ঋষি কর্ত্তৃক প্রচারিত। আমরা বৈদিক কালের ও ঔপনিষদ কালের প্রামাণ্য সূত্রাদি উদ্ধৃত করিয়া বেদ তিন কি চারি, তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম।

বৈদিক কালের প্রমাণ।

১ম। ঋগ্বেদে যথা——"অহো বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপয়া যং ঋষয়ঃ স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি।"

২য়। "পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বী প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ তস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি।"

৩য়। শতপথ ব্রাহ্মণে যথা——

"প্রজাপতি র্বা ইদমগ্র আসীৎ সোহশ্রাম্যৎ স তপোহতপ্যত তস্মাচ্ছ্রান্তাৎ তেপানাৎ ত্রয়ো লোকা অসৃজ্যন্ত পৃথিব্যন্তরীক্ষং দ্যৌ স

ইমান্ ত্রীন্ লোকান্ অভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্য-স্ত্রীনি জ্যোতিংষ্যজায়ন্ত অগ্নির্যোহয়ং পবতে সূর্য্যঃ স ইমানি ত্রীনি জ্যোতিংষ্যভিততাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়োবেদা অজায়ন্ত অগ্নে ঋগ্বেদো বায়ো যজুর্ব্বেদঃ সূর্য্যাৎ সামবেদঃ স ইমাং-স্ত্রীন্ বেদান্ অভিতপাপ তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রীনি শুক্রাণ্যজায়ন্ত ভূরিত্যৃগ্বেদাদ্ভুব ইতি যজুর্ব্বেদাৎ স্ব রিতি সামবেদাৎ।"

অর্থাৎ প্রজাপতিই অগ্রে ছিলেন, তিনি শ্রম পূর্ব্বক তপ করিলেন ; তাঁহার শ্রম এবং তপ হইতে ভূলোক, ভূবলোক, ও স্বর্লোক সৃষ্ট হইল। তিনি ঐ তিন লোককে অভিতপ্ত করিলেন, ঐ অভিতপ্ত লোকত্রয় হইতে অগ্নি বায়ু এবং সূর্য্য এই জ্যোতিত্রয় উৎপন্ন হইল। পরে ঐ জ্যোতি-ত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উৎপন্ন হইল। পুনশ্চ ঐ বেদত্রয়কে অভিতপ্ত করাতে তিন শুক্র উৎপন্ন হইল—ঋগ্বেদ হইতে ভূ, যজুর্ব্বেদ হইতে ভূব, সামবেদ হইতে স্বঃ।

বৈদিক কালের অব্যবহিত পরেই ভগবান মনু স্মৃতি-শাস্ত্র প্রচার করিলেন, তাহাতেও ত্রিবেদ।

১ম। "অগ্নি বায়ু রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌যজুঃ সাম লক্ষণং।"

অর্থাৎ অগ্নি হইতে সনাতন ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ, সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।

২য়। "বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্ব রিতীতিচ।"

৩য়। "ত্রিভ্য এবতু বেদেভ্যঃ পাদং পাদ
মদূদুহৎ।"

অপিচ "ঋগ্বেদো দেব দৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু
মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ।" "এতদ্বিদন্তো বিদ্বাংস স্ত্রয়ী-
নিষ্কর্ষমন্বহং।"

মনুসংহিতা, ২য়, ৪র্থ অধ্যায়।

মনু বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিন জ্যোতি হইতে সাম, ঋক্ ও যজু, এই তিন বেদের উৎপত্তি বলেন এবং অন্যান্য অধ্যায়ে যথায় বেদের উল্লেখ করিয়াছেন তথাতেই সুস্পষ্টরূপে ত্রিবেদ স্বীকার করিয়াছেন, কোথাও অথর্ব্ব-বেদের নামোল্লেখ করেন নাই। অপরাপর প্রাচীন সংহিতাতেও অথর্ব্ববেদের নাম পাওয়া যায় না। যাহা হউক যাঁহারা চতুর্ব্বেদ স্বীকার করেন, তাঁহারা এইরূপ তর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহারা—

বৃহদারণ্যকের "অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্দৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।"
অর্থাৎ সেই পরমাত্মা হইতে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ নিশ্বাসের ন্যায় অবলীলাক্রমে নির্গত হইয়াছে, এইরূপ প্রমাণ দেখান।

যাঁহারা এই রচনা দ্বারা চতুর্ব্বেদ প্রমাণ করেন, তাঁহারা আংশিক অথবা পূর্ণরূপে সত্যের অপলাপ করিয়া স্বমত রক্ষা করেন। কিন্তু ঐ বচনের উত্তরার্দ্ধ একেবারে পাঠ করেন না। পূর্ণ বচনটী এই, যথা—

"স যথার্দ্রৈন্ধাগ্নে রভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতদ্য দৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণবিদ্যাউপনিষদঃ শ্লোকা সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্মৈবৈতানি সর্ব্বানি শিক্ষাকল্পব্যাকরণনিরুক্তং চ্ছন্দোজ্যোতিষ মিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।"

এই বচনানুসারে দেখান যে বেদচতুষ্টয় সেই পরমাত্মার নিঃশ্বসিত, কিন্তু ঐ শ্লোকের ভাবার্থে কি ইহা বোধ হয় না

যে ইতিহাস, পুরাণ, সূত্র, ব্যাখ্যা, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ইত্যাদিও বেদের ন্যায় সৃষ্ট। যখন বৃহদারণ্যকে ইতিহাস ও শিক্ষা কল্পাদিকেও ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত বলিয়াছেন তখন আমরা তাহারই বিশেষ সমালোচন ও তত্তৎশাস্ত্র প্রণেতাগণের নামোল্লেখ করিব।

বেদ—সাম, ঋক্, যজু। অথর্ব্ববেদ কেবল শান্তিক পৌষ্টিক আভিচারিক কার্য্যে প্রতিপন্ন হয়। বেদাঙ্গ ছয়—শিক্ষাশাস্ত্র দ্বারা উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বর ও ব্যঞ্জনাদি বর্ণ সকলের উচ্চারণ জ্ঞান জন্মে। কল্পশাস্ত্র দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান জন্মে। ব্যাকরণ—মহেশ প্রণীত মাহেশ ও ঋষি প্রণীত পাণিনী, ইহা দ্বারা বৈদিক সূত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি জ্ঞান জন্মে। যাস্ক ঋষি নিরুক্তশাস্ত্র রচনা করেন, ইহাতে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ নির্ণয় হয়। ছন্দশাস্ত্র পিঙ্গল ঋষি রচনা করেন, ইহাতে বেদোক্ত মন্ত্রের ছন্দ নিরূপণ আছে। জ্যোতিষ—আদিত্য, গর্গ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণয়ন করেন, ইহাতে অদৃষ্টাধীন ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান কালের শুভাশুভ পরিজ্ঞান হয় ও তিথি নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যাদির গ্রহণ জানা যায়। এই গেল বেদাঙ্গ। অপিচ বেদের উপাঙ্গ চারি, যথা পুরাণ—মহর্ষি বেদব্যাস ও অন্যান্য ঋষিপ্রণীত মৎস্য কূর্ম্ম ইত্যাদি। ন্যায়শাস্ত্র মহর্ষি গৌতম রচনা করেন। বাদরায়ণপ্রণীত—ব্রহ্ম মীমাংসা বা বেদান্তদর্শন, জৈমনী-প্রণীত—কর্ম্ম মীমাংসা। ধর্ম্মশাস্ত্র—মন্বাদির স্মৃতি। বৃহদা-

রণ্যক স্পষ্টরূপে যে প্রমাণ দেয় তাহাতে অনুমিত হয় যে, সূত্রস্থ সমস্তই ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত; কিন্তু আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণে দেখাইলাম যে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ ও পুরাণাদি ঋষি লেখনী নিঃসৃত।

বিশেষতঃ বৃহদারণ্যকে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে পূর্ব্বোক্ত বেদাদি ও শিক্ষাকল্পাদি অপরা বিদ্যা, এবং ব্রহ্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা। উহাতে যখন বেদাদিকে সামান্য ইতিহাস ব্যাকরণের ন্যায় সৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তখন বৃহদা-রণ্যককে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অপিচ বৃহদারণ্যক মধ্যবর্ত্তী কালের। বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা পরে বেদ বিভাগ করিয়া চতুর্ব্বেদ আখ্যা প্রদান করেন। কেন না উপনিষদ ও পৌরাণিক কালেই মাত্র চতুর্ব্বেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারত রচনান্তে যখন মহর্ষি বেদব্যাস অভিমানোন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র বেদকেও তদীয় মহাভারতের নিকটে লঘুরূপে প্রতিপন্ন করিলেন তখনই স্পষ্টরূপে চতুর্ব্বেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

“একতশ্চতুরো বেদান্ ভারতং চৈতদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম॥
চতুর্ভ্যঃ স রহস্যেভ্যো বেদোভ্যোঽধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽপি মহাভারতমুচ্যতে॥”

যাহা হউক, ইহা নিশ্চয় যে বৈদিক কালে ও আর্ষ কালে যখন অথর্ব্ববেদের নাম উল্লেখ নাই তখন আদি বেদ যে তিনটী তাহার সন্দেহ নাই। যদিও উপনিষদ, বিষ্ণু-পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে চতুর্ব্বেদের নাম পাওয়া যায় কিন্তু দেখিতে হইবে যে ঐ সকল গ্রন্থ ঋগ্বেদ, মন্বাদিরস্মৃতি, এবং শতপথ ব্রাহ্মণাদির নিকট নিতান্ত নব্য গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে ত্রিবেদই আদি।

ঋগ্বেদের সূত্রে পাওয়া যায় যে, আর্য্যগণ যখন যে বস্তুর অথবা যে ব্যক্তির নিকট উপকার পাইতেন তাহারই গুণ বর্ণন করিতেন; কাল ক্রমে তাহাই হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, বেদবিষয়ে দার্শনিক-দিগের কিরূপ মত তাহা সমালোচিত হইল। এ সম্বন্ধে আমাদিগের কোনও মতামত দিবার অধিকার নাই। তবে সুরগুরু বৃহস্পতির বাক্য অনুমোদন করিয়া আমরাও বলি যে—

"কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য নকর্ত্তর্ব্বোহর্থ নির্ণয়।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।"

ইতি দশম অধ্যায়।

সমাপ্ত।